নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে, সমগ্র বিশ্বের শোষিত জনগণের মুক্তিসংগ্রাম যখন শেষ বিজয়ের দিকেই এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল, সেইসময় বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ কয়েকটি দেশের নেতৃবর্গের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সেই সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে। কীভাবে তা ঘটতে পারলো ? কমরেড ঘোষ এই আলোচনায় তার মূল কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন — কোন পথে, কীভাবে শোধনবাদের বিপদ মোকাবিলা করা সম্ভব।

এ বছর আমরা কতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালন করছি। আপনারা জানেন, সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দুনিয়ার শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনগুলোর সামনে একটা বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তারপর সেই অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটতে ঘটতে আজ আবার তা কোন্ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাও আপনারা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করছেন। এই বিষয়টি কেন ঘটল, আমি মনে করি, নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা, উদ্দেশ্য এবং নভেম্বর বিপ্লব মানবজাতি ও শোষিত জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের সামনে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে, তার পরিপ্রেক্ষিত আমাদের নভেম্বর বিপ্লব দিবসে আর একবার বিবেচনা করা দরকার।

শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামগুলি আজ একটা অত্যন্ত জটিল ও গুরুতর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি দেশের শোষিত মানুষের সংগ্রামের রূপ এবং আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য বা বৈচিত্র যাই থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রতিটি দেশের গণআন্দোলনগুলোকে একটা খুবই সংকটময় পরিস্থিতির সামনে আজ পড়তে হচ্ছে। যেসব দেশে আজও বিপ্লব সংগঠিত হয়নি, অর্থাৎ যেসব দেশে আজও শ্রমিক-চাষী ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়নি, অথবা যেসব দেশে আজও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, সার্বভৌমত্ব স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছেন, সেইসব দেশের আন্দোলনগুলোকে আজ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর একটা তীব্র প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের সামনে পড়তে হচ্ছে? এর কারণ কি? এর স্বরূপই বা কি? সেটা আলোচনা করে দেখা যাক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী সংগ্রামগুলোর সামনে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সমান্তরাল বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতি, পূর্বের তুলনায় সাম্রাজ্যবাদের শক্তিহীনতা, সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বহু দেশের স্বাধীনতালাভ, নূতন নূতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর নিজ নিজ দেশের জাতীয় সরকার গঠন, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি প্রভৃতির ফলে দুনিয়াজোড়া এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে মনে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের আয়ু বোধহয় আর বেশি দিন নেই। মনে হয়েছিল দেশে দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী, তথা শোষিত মানুষের স্বপ্ন দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনগুলোর সামনে সত্যই এরকম উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

এককভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নেরই শক্তি তখন ছিল প্রচণ্ড। সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অনস্বীকার্য। তখন সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সম্মিলিত শক্তিকে যেন একাই মোকাবিলা করার মত শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের আছে বলে মনে হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ, চীন বিপ্লবের মধ্য

দিয়ে চীনে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে ৭০ কোটি মানুষের চীন তার প্রবল শক্তি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগ দিল। তাছাড়াও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি এবং মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম প্রভৃতি জনগণতান্ত্রিক দেশগুলো নিয়ে এক বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে শুধু যে বিশ্বের শক্তিসমূহের ভারসাম্য পাল্টে গেল তাই নয়, একদিকে পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের যে দাপট ছিল, সে দাপট যেমন সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে গেল — সাম্রাজ্যবাদ পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে পড়ল, অপরদিকে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো তখন যৌবনচাঞ্চল্যে টগবগ করছে এবং এক-পা দু-পা করে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। দুনিয়াজোড়া তখন গণআন্দোলনের একটা যথার্থই প্রচণ্ড জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্ত বানচাল করাই ছিল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাজ

বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী মুক্তিকামী ও শান্তিকামী জনগণের সামনে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা হিসাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন বিরাজ করছিল। লেনিন-স্ট্যালিনের হাতে গড়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র হিসাবে দুনিয়াজোড়া মানুষের মনে তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আসন তখনও অটুট ছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই সোভিয়েট ইউনিয়নেরই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শান্তি আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন দেশের গণআন্দোলনগুলোকে সংযুক্ত (কো-অর্ডিনেট) করাই ছিল তখন তার কাজ। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিং' বা 'আণবিক যুদ্ধাতঙ্কের' স্বরূপ প্রকাশ করে শিবিরের আণবিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদের এই 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিং' বা 'আণবিক যুদ্ধাতঙ্কের' স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়াই শুধু নয়, আমেরিকান সাম্রাজ্যবা দুনিয়াজোড়া নানা জায়গায় আঞ্চলিক যুদ্ধ, খণ্ডযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া, একের বিরুদ্ধে অপরকে যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে দেওয়া, বা 'ক্যাশ এ্যাণ্ড ভায়োলেন্স'-এর নীতি, বা সি আই এ-এর দ্বারা সামরিক বাহিনীর মধ্যে দালাল সৃষ্টি করে ক্যুপ সংগঠিত করার মাধ্যমে অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, প্রভৃতি যে ঘৃণ্য রাজনীতি করে চলেছে, তার শুধু মুখোস খুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, তার বিরুদ্ধে একটা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি সমাবেশ ঘটানোই ছিল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান কাজ। শুধুমাত্র একটা নৈতিক বিরুদ্ধতা নয়, সাম্রাজ্যবাদীদের এই ঘৃণ্য চক্রান্তকে যে কোন মূল্যে রুখবার চেতনা নিয়ে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসাই ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তব্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের 'শান্তি চাই' শ্লোগানটার বাস্তবে একটা আদর্শগত মূল্য ছাড়া কার্যকরী মূল্য বিশেষ কিছুই ছিলনা। নৈতিক ও মানবিক মূল্য তার একটা ছিল — কিন্তু, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার মত যথেষ্ট শক্তি তখন তার ছিলনা। দুনিয়াতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন একা। ফলে, তার কথায় সেদিন কেউই কর্ণপাত করেনি। সাম্রাজ্যবাদের মর্জি বা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সংঘাতের স্বাভাবিক নিয়মের ফলেই তখন বিশ্বের সমস্ত ঘটনাবলীই নির্ধারিত হত। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অর্থনীতির প্রয়োজনে, রাজনীতির প্রয়োজনেই ঠিক করতে কতদিন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বজায় থাকবে এবং কখন যুদ্ধ লেগে যাবে। তাই সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে তখন 'শান্তি'র শ্লোগান তুলে একট নৈতিক প্রভাব বিস্তার করাই কেবলমাত্র সম্ভব ছিল। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের উপর কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করা, তাদের যুদ্ধ চক্রান্তকে রোখা, বাধা দেওয়া, বা যুদ্ধ হবে, কি শান্তি বজায় থাকবে — তা নির্ধারণ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের ছিল না।

এখানে যে শান্তি বজায় রাখার কথা আমি আলোচনা করছি, তা হল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে না — এরকম একটা অবস্থা বজার রাখার কথা। এই বিশ্বশান্তি বজায় থাকবে, নাকি যুদ্ধ লেগে যাবে, অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে — এ বিষয়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরাই নির্ধারণ করত। তাই "লীগ অব নেশনস্" টেকেনি। সোভিয়েট ইউনিয়নের আহ্বানে সেদিন কেউ কর্ণপাতও করেনি। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে নিয়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির হিসাবে একটা শক্তিশালী শিবিরের অভ্যুত্থান ঘটল এবং সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্বের বিরাট

একটা ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হল। ফলে, সাম্রাজ্যবাদ অধিকতর সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যে চূড়ান্ত আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলে বাজারে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজেরাই একে অপরের সঙ্গে যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, যুদ্ধ সেই বাজার সঙ্কটকে আরও তীব্রতর করে দিল। কারণ, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পূর্বের বিশ্ব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বাজার অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে গেল। পূর্বে এক রাশিয়াকে বাদ দিয়ে গোটা দুনিয়ায় যে পুঁজিবাদী বাজার ছিল, সমাজতান্ত্রিক শিবির সৃষ্টি হওয়ার ফলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি পুঁজিবাদী বাজারের আওতা থেকে বেরিয়ে গেল। ফলে, কি দেখা গেল? না, পূর্বের এই গোটা দুনিয়াটা পুঁজিবাদীদের এবং সাম্রাজ্যবাদীদের লুটের বাজার থাকা সত্ত্বেও বাজার সংকটের তীব্রতার জন্য যে দু-দুটো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হয়ে গেল, যুদ্ধ পরবর্তী যুগে যখন সেই বাজার আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বাজার নিয়ে লড়াই আরও তীব্র আকার ধারণ করতে শুরু করল।

এই অবস্থার মধ্যে আবার নতুন একটা নতুন অবস্থা এসে গেল। তা হল, এশিয়া-আফ্রিকার নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি নিজের নিজের দেশের পুঁজিকে এবং শিল্পকে সংহত করার জন্য যতটুকু সামর্থ্য সেই অনুযায়ী আপ্রাণ চেষ্টা করতে শুরু করল এবং তার ফলে তারাও নিত্য নতুন প্রতিযোগী হিসাবে এই সঙ্কুচিত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বাজারে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাতে থাকল। এই সমস্ত নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রত্যেকের আধিপত্যের জন্য একদিকে নিজেদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা রয়েছে, অপরদিকে আবার বনেদী সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে একটা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তাদের নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও একই সাথে দেখা গেল। এই প্রচেষ্টারই ফলস্বরূপ এশিয়া-আফ্রিকা সংহতি সংস্থা, কলম্বো সম্মেলন, বান্দুং সম্মেলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো (রিসারজেন্ট ন্যাশানালিস্ট কান্ট্রিস) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় মোকাবিলা করার শক্তি সংগ্রহের জন্য একটা সম্মিলিত মোর্চা গড়ে তুলল। যেহেতু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে এ কাজ তাদের পক্ষে করা সম্ভব ছিলনা, সেহেতু তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর খবরদারী থেকে মুক্ত থেকে এই বাজারগুলোতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ও শিল্পবিকাশের প্রচেষ্টা করতে থাকল।

বিশ্বপরিস্থিতিটা তখন এইরকম ছিল যে, উপরোক্ত পরিস্থিতির সাথে এমনকী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরেও যুদ্ধ বিরোধী আওয়াজ উঠছিল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনা গড়ে উঠছিল। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই দেখা গেল আমেরিকার আর একটি রণহুঙ্কারের মনোভাব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এরকম হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বহুদিন পর্যন্ত দুনিয়াজোড়া একটা শান্তির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। তার জন্যই 'লীগ অল নেশনস্' তৈরী হয়েছিল। কিন্তু এবারে ইউ এন ও প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমেরিকার একটা 'রণংদেহী' ভাব দেখা যাচ্ছে। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলোকে সাথে নিয়ে আর একটা যুদ্ধ বাধাবার প্রয়োজন তার দেখা দিয়েছে। তা নাহলে তার অর্থনীতি আজ আর টিঁকে থাকছে না। এ একটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয় — তার মধ্যে বিশদভাবে আমি আজ আর যেতে চাইনা। তবুও আপনাদের বুঝবার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে খানিকটা আলোচনা করছি।

সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সামরিকীকরণের ঝোঁক

বিষয়টি মোটামুটিভাবে হল এইরকম — আমেরিকার অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং তার সমস্যা হল বাড়তি পুঁজির সমস্যা (এক্সেস ক্যাপিটাল), অর্থাৎ বাড়তি লগ্নীপুঁজির সমস্যা। আপনারা জানেন, পুঁজি বসে থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষ না জানলেও অন্ততঃ অর্থনীতির ছাত্রদের একথাটা জানা উচিত। আর যদি না জানা থাকে, তাহলে জেনে রাখুন যে, পুঁজি এমন একটি জিনিস, যার সৃষ্টি হয়েছে বসে থাকার জন্য নয়। বসে তিনি থাকতে পারেন না। বসে থাকলেই তিনি কিছু না কিছু অনিষ্ট করবেন। তার গতি চাই। পুঁজি বসে থাকলে কি অনিষ্ট করে? অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির একটা ঝোঁক দেখা দেয়, জিনিসপত্রের দাম চড়চড় করে বাড়তে থাকে। কারণ টাকা যদি কাজ না করে তাহলে উৎপাদন বাড়তে পারে না। ফলে, টাকার তুলনায় উৎপাদন কম হয় বলে টাকার দাম জলের মত কমতে থাকে। কিন্তু, টাকার দাম জলের মত পড়লেও কোন অসুবিধা হতনা, যদি এক একটি সাধারণ মানুষের রোজগার দু'হাজার-পাঁচহাজার হত। অথচ, পুঁজিবাদী

ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের আয় সেই অনুপাতে বাড়তে পারে না। তাদের আয় পূর্বের তুলনায় টাকার অঙ্কে কিছুটা বাড়ে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত আয় বাড়ে না। বরং কমেই যায়। অথচ, মুদ্রাস্ফীতি যদি প্রচণ্ডভাবে হতে থাকে, তবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় এবং সমাজজীবন পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। আর, টাকা জমছে — মানেই হল যে, শিল্পে তার বিনিয়োগের রাস্তা বন্ধ এবং এই বিনিয়োগের রাস্তা বন্ধ হলেই উৎপাদন স্তিমিত হয়ে আসবে। ফলে, বেকার সমস্যা বাড়তে থাকবে। তার উপর সমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া তো আর একটি বাড়তি সমস্যা। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, লোকসংখ্যা আর বাড়ছে না, তাহলেও আজ যে লোকসংখ্যা আছে, তাতেও বেকার সমস্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে।

কারণ, উৎপাদন বেশীদিন ঠিক একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। উৎপাদন যদি বাড়তে না পারে, তবে তা কমতে বাধ্য। কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'বাজার' বা চাহিদা হয় বাড়ে, না হয় কমে। আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই চাহিদা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের প্রয়োজনটা তার ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বাজার দর অনুযায়ী এবং আয় অনুপাতে মানুষের কেনবার ক্ষমতা কতটা — তার হিসাব ধরে তার প্রয়োজন নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে আবার উৎপাদন কম হতে থাকলে জিনিসপত্রের বাজার দর বাড়তে থাকে এবং স্বল্প আয়ের লোকদের এবং বেকারদের ক্রয়ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে আরও কমে যায়। ফলে বাজার আরও সঙ্কুচিত হয়। তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগের একটা রাস্তা তার চাই। দ্বিতীয়তঃ, একটা পুঁজিবাদী দেশে যতটুকু শিল্প আছি, যতটুকু চাকরী-বাকরীর সুযোগ আছে তাতে সমস্ত মানুষকে চাকরি দেওয়া যায় না। অথচ, গোটা দেশটা বেকারে ভর্তি হয়ে যাবে, তাও তারা হতে দিতে পারে না। কেননা তা আরও গভীর সঙ্কটই সৃষ্টি করবে। ফলে, স্বাভাবিকভাবে শিল্পোদ্যাগ গড়ে তুলে উৎপাদন যখন তারা বাড়াতে পারে না, তখন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতিতে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করার একটা ঝোঁক দেখা দেয়, অর্থাৎ শিল্পে সামরিকীকরণের একটা ঝোঁক দেখা দেয়। এর সুবিধা হল যে, এই পথে কৃত্রিম উপায়ে বাজারে তেজীভাব সৃষ্টি করা সাময়িকভাবে হলেও সম্ভব হয়। আর, বাজারে তেজীভাব না থাকলে শিল্পগুলো চলে না, উৎপাদন বাড়ে না, পুঁজি বিনিয়োগের কোনও প্রকার তাগিদ থাকে না। ফলে, কারখানায় 'শিফট্' বন্ধ হয়ে যায়, কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে দেশের মধ্যে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। এই কারণেই আমেরিকায় বেকার বাড়ছে। অথচ, এইভাবে যদি ক্রমাগত বেকার সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে বেকার বৃদ্ধির চাপেই গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাটা একদিন ভেঙ্গে পড়ে যেতে পারে এবং উৎপাদন ব্যবস্থা ও শিল্পোদ্যাগ খাড়া রাখা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। ফলে, এই অবস্থার হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে কৃত্রিম উপায়ে বাজারে তেজীভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই বিশেষ অবস্থাতেই শিল্পে সামরিকীকরণের ঝোঁক দেখা যায়।

এই শিল্পের সামরিকীকরণ বলতে কি বোঝায়? শিল্পের সামরিকীকরণ বলতে বোঝায়, সরকার যেখানে নিজেই অর্ডার দেয়, আবার সেই তৈরী মাল সরকার নিজেই কেনে। উৎপাদিত মাল বিক্রীর জন্য বাজারের উপর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না। শুধু সামরিক খাতে সরকারের বাজেট বাড়তে থাকে। ফলে, মন্দা — অর্থাৎ, যাকে আমরা বলি বাজার নেই, কাজকর্ম নেই, অর্ডার নেই — এই সমস্যার হাত থেকে সাময়িকভাবে হলেও শিল্পগুলো বাঁচে। অবস্থাটা দাঁড়ায় এইরকম যে, সরকার নিজেই 'প্লেন' তৈরী করার, 'ফাইটার' তৈরী করার এবং নানারকম সামরিক সরঞ্জাম তৈরী করার অর্ডার দেয়, আবার ঐ তৈরী মালগুলি সরকারই কেনে। ফলে, বাজারের উপর বা লোকের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না বলে সাময়িকভাবে 'রিসেশন' বা বাজার-মন্দার চাপ থেকে অর্থনীতিকে কিছুটা পরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব হয়। কিন্তু, এই পরিকল্পনার আবার একটা কন্ট্র্যাডিকশন বা উল্টোদিক আছে। তা হল এই যে, যত মাল বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হতে থাকবে — সেগুলো যদি বসে থাকে, অর্থাৎ সেগুলো যদি খালাস করা না যায়, তাহলে মাল ক্রমাগত জমতে থাকার ফলে অর্থনীতিতে বন্ধ্যাত্বের ঝোঁক (টেন্ডেনসি অব স্ট্যাগনেশন)-এর জন্ম হবে এবং এর ফলে সামরিক শিল্পেও আবার লালবাতি জ্বলতে শুরু করবে। অথচ, সরকারও বিনা প্রয়োজনে ক্রমাগত এই মালগুলো কিনে গুদামজাত করতে পারে না। কাজেই এই মাল খালাস করার প্রয়োজনেই তাদের চাই স্থানীয় এবং আংশিক যুদ্ধ। এই মূল অর্থনৈতিক বুনিয়াদ থেকেই একের পর এক যে সঙ্কট সৃষ্টি করে চলেছে তার থেকেই তার বর্তমান যুদ্ধনীতির উদ্ভব হয়েছে।

সঙ্কটজর্জরিত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার জন্যই সাম্রাজ্যবাদের আঞ্চলিক ও স্থানীয় যুদ্ধ প্রয়োজন

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের এই যে একের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করা, ওর বিরুদ্ধে তাকে লাগিয়ে দেওয়া, সমস্ত আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় কর্তৃত্ব করে বেড়ানো, ঘর চড়াও হয়ে সকলের 'ভাল করে' বেড়ানো, সবাইকার 'স্বাধীনতা রক্ষা' করে বেড়ানোর যে রাজনীতি — তার আসল রহস্যটা হচ্ছে এই জায়গায়। শান্তি আজ আমেরিকান পুঁজিবাদী অর্থনীতির পক্ষে একটা মস্ত বড় কবর। কাজেই আন্তর্জাতিক যুদ্ধ তারা বাধাতে পারুক, বা না পারুক — এখানে-সেখানে আঞ্চ লিক এবং আংশিক যুদ্ধ তাদের চাই-ই। কারণ ক্রমাগত সামরিক শক্তি তাদের বাড়াতে হবে। আর, এইভাবে সামরিক শক্তি এবং উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে তার স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে মাল খালাস করার জন্য মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ বা সংঘর্ষ (কন্‌ফ্ল্যাগ্রেশন) তার দরকার। এখন, এই যুদ্ধ মানে কি শুধু বিশ্বযুদ্ধ ? কেউ যুদ্ধ বিরোধী — একথার মানে কি এই যে, শুধু বিশ্বযুদ্ধ চায় না? অপরের ঘর চড়াও হয়ে যে যুদ্ধ, বা এখানে-সেখানে যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ — সেটা কি কোন যুদ্ধ নয়? আমেরিকা যে অপরের ঘর চড়াও হয়ে ক্রমাগত এর বিরুদ্ধে তাকে, তার বিরুদ্ধে ওকে যুদ্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে, ওকে তার খবর পরিবেশন করছে, আবার তাকে গিয়ে ওর খবর বলে দিচ্ছে এবং তার দ্বারা পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত করে দিচ্ছে — এগুলি কি যুদ্ধ নয়? ধরুন, রাম এবং শ্যাম দু'জন ব্যক্তি। রামকে সে গিয়ে বলছে, শ্যাম তোমার বিরুদ্ধে এই করেছে, আবার শ্যামকে রামের গুপ্ত খবর সব দিয়ে দিচ্ছে এবং বলছে যে, রাম আবার তোমার বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত করছে। এইভাবে দু'জনকেই একের বিরুদ্ধে অপরকে ভিতরে ভিতরে খবরাখবর দিচ্ছে — উদ্দেশ্য হ'ল, একজনকে অপরের বিরুদ্ধে লাগানো। সমস্ত দুনিয়াজোড়া আন্তর্জাতিক গুপ্ত সংস্থার দ্বারা তারা এইভাবে কাজ করে চলেছে।

গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। কেন করেছে, এ ব্যাপারে তার উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার ছিল, মুখে সে যাই বলুক না কেন। পকিস্তানের 'কাশ্মীর চাই' — এই দাবীর পিছনে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে, উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সাহায্য করা থেকে শুরু করে সে সবই করেছে। বাস্তবে আমেরিকা এবং বৃটিশ 'লবি'র পরামর্শে এবং সাহায্যেই পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢুকেছে। আবার, পাকিস্তান থেকে এই যে অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢুকেছে, সি আই এ আবার গোপনে সে খবর ভারতবর্ষকে দিয়ে গেছে। অর্থাৎ, ভারতবর্ষকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, তোমাদের দেশে কিন্তু অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে। অর্থাৎ, দু'পক্ষকেই বলছে, ভালো করে লাগো। পাকিস্তানকে বলছে, ভারতে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে আবার আজাদ কাশ্মীরের প্রশ্ন ইউ এন ও-তে তুলতে, নাহলে সে কিছু করতে পারবে না। আবার ভারতবর্ষে এসে বলেছে যে, অনুপ্রবেশকারী কিন্তু ঢুকেছে। খবরে জানা যায়, পাকিস্তানের এই অনুপ্রবেশকারী পাঠানোর সংবাদ সি আই এ-ই প্রথমে এসে ভারতবর্ষকে দিয়েছে। এইভাবে আমেরিকা পিছনে থেকে দু-দেশের লড়াইয়েরই কলকাঠি নাড়ছে। আমরা সে জায়গায় কি করেছি না করেছি, সেগুলো অন্য আলোচনা। আমি এই উদাহরণটা দিয়ে শুধু দেখাতে চাইলাম যে, আমেরিকার এই রাজনীতির ধরণটা কি।

তাহলে এই হচ্ছে সেই আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশ — যে একদিন 'লিবার্টি' (স্বাধীনতা) ও গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা তুলেছিল। সেই আমেরিকা আজ দেশে দেশে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে। আমরা, কমিউনিস্টরা, তাদের সম্বন্ধে কটু কথা বলি, বিষয়টা এভাবে কেউ দেখলে ভুল হবে। সেই কারণেই এই বিষয়টা খানিকটা ভাল করে বুঝিয়ে বলা দরকার। ইউরোপের দু'টি লোকের নাম আমি করতে পারি যাঁরা কমিউনিস্ট নন — তাঁরা হলেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং জাঁ পল সার্ত্রে, যাঁদের চিন্তার সাথে কমিউনিস্ট চিন্তার মৌলিক কোন সম্বন্ধ নেই, এমনকি তাঁদের তত্ত্বগতভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী, বা কমিউনিস্ট বিদ্বেষী বলা যায় এবং তাঁদের চিন্তা বুর্জোয়াদের হাতে, প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে একটা মস্তবড় অস্ত্র হিসবে আজ কাজ করছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, তাঁরা নিজেরা সৎ লোক, তাঁদের একটা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আছে, বিশ্বাস আছে, তাঁরা পুরানো দিনের মানবতাবাদী। কিন্তু, তাঁদের কোনমতেই বলা যাবে না যে, তাঁরা কমিউনিস্ট। এই বার্ট্রাণ্ড রাসেল ৯৫ বছর বয়সে বললেন যে, আমেরিকাকে আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা চলে না। বললেন, ইট ইজ এ সরডিড মিলিটারি রেজিম, ইট ক্যান নেভার বী কল্‌ড এ ডেমোক্র্যাটিক গভর্ণমেণ্ট — যার অর্থ হল, এটা একটা ঘৃণা, জঘণ্য সামরিক ব্যবস্থা, একে কোনমতেই গণতান্ত্রিক সরকার বলা চলে না। স্টকহলম-এ তিনি যে 'ওয়ার ক্রিমিনালদের একটা ট্রায়াল কোর্ট' বসিয়েছিলেন, সেই কোর্টে আমেরিকান রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই ভাষ্যটি তিনি দেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ৯৫ বছর বয়সে আর কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া জীবনভোর তিনি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়েছেন এই কারণে যে, তিনি মনে করেন, কমিউনিস্টরা ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বয়সটা যদি কম থাকত এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে বিচার করার সুযোগ পেতেন তবে বোধহয় তিনি বুঝতে পারতেন যে, ঐসব তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়ানেওয়ালারা দুনিয়াকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশ, ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ আমেরিকা আজ দস্যুর দেশে পর্যবসিত। এমন ঘৃণ্য কাজ নেই, যা সে করে না। নাৎসীরা যুদ্ধাপরাধী বলে নিন্দিত হয়েছে। আমেরিকা আজ ভিয়েতনামে যা করছে এবং দুনিয়ার আরও বহু দেশে যা যা করে বেড়াচ্ছে, তা নাৎসীদেরও লজ্জা দেয়। 'গেষ্টাপো' কার্যকলাপ এবং পঞ্চ মবাহিনীর কার্যকলাপকে মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে একটা জঘন্য চক্রান্ত বলা হয়েছে। আমি প্রশ্ন করতে চাই, এই সি আই এ এবং এস বি আই কি করে বেড়াচ্ছে? হেন দুষ্কর্ম নেই — যা এরা করে বেড়াচ্ছে না। রাজনৈতিক খুন সংগঠিত করা, আভ্যন্তরীণ "ক্যুপ" সংগঠিত করা থেকে শুরু করে সমস্ত রকম ঘৃণ্য কার্যকলাপই এরা দুনিয়া জুড়ে করে বেড়াচ্ছে। তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপের একটাই উদ্দেশ্য — তা হচ্ছে, দুনিয়ায় এখানে সেখানে সর্বত্র যুদ্ধ বিগ্রহের মনোভাব জীইয়ে রাখা, খণ্ড যুদ্ধ সৃষ্টি করা, একের বিরুদ্ধে অপরকে যুদ্ধে লিপ্ত করা, যাতে যেসব প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রগুলো ক্রমাগত তার কাছে গুদামজাত হয়ে জমে যাচ্ছে, অকেজো হয়ে যাচ্ছে, অপরদেশে পাচার করার দ্বারা সে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলোর একটা গতি হয়। ফলে, এভাবে যত লড়ালড়ি চলতে থাকবে, ততই তাদের লাভ।

সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ চক্রান্ত বানচাল করার পরিবর্তে বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্ব নিজেই আমেরিকার 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিং'-এর রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়ে গেল

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা হিসাবে রাশিয়ার উচিত ছিল, আমেরিকার এই ঘৃণ্য চরিত্র ও রাজনীতিটাকে সঠিকভাবে বুঝে তার স্বরূপ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের এই আন্তর্জাতিক দস্যুতার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিপ্লবী গণআন্দোলনের সাথে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাজনীতিকে সংযুক্ত করা। কিন্তু, সোভিয়েট রাশিয়া — আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের এই ঘৃণ্য রাজনীতিটা ধরতেই ব্যর্থ হল। আমেরিকা গোড়া থেকেই 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিং' বা আণবিক যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টির যে রাজনীতিটা চালাচ্ছে, তার একটা উদ্দেশ্য আছে। সে খুব ভালভাবেই জানে যে, আণবিক শক্তি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যতক্ষণ শ্রেষ্ঠত্ব আছে, ততক্ষণ আণবিক যুদ্ধ সে লাগাতে পারে না। কারণ, এই অবস্থায় আণবিক যুদ্ধ লাগলে ক্ষতি আমেরিকারই সবচাইতে বেশী হবে, কেননা সে নিজেই শেষ হয়ে যাবে। তাই সে দুনিয়ার সামনে একটা ধম্‌কি রাখছে, ভীতির সৃষ্টি করতে চাইছে। আণবিক যুদ্ধ লাগলে সারা দুনিয়াটা কিভাবে "ফুস" করে ছাই হয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে নানা লোমহর্ষক গল্প-কাহিনী প্রচার করে — যেমন এইচ ডি ওয়েলস্-এর মত কিছু লোক বিজ্ঞানের নামে গল্প বানাচ্ছে, সিনেমায় গল্প দিচ্ছে — সারা দুনিয়ার মানুষের মনে সে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাইছে। এইরকম একটা মনোভাব সৃষ্টি করতে চাইছে যে, আণবিক যুদ্ধ যদি লেগে যায়, তবে মানবজাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর, মানুষের জন্যই তো সব। ফলে, মানুষ ও সভ্যতা যাতে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় — এমন কাজ করা কখনই উচিত নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমেরিকার এই মনোভাব ছড়ানোর উদ্দেশ্য হল, সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ভয় দেখান যে, তাকে খোঁচাতে গেলে যুদ্ধ লেগে যাবে — কাজেই সাবধান। কি অদ্ভুত কথা দেখুন! বিশ্বযুদ্ধ যাতে লেগে না যায় সেটা দেখার দায়িত্বটা শুধু অন্যের, তাদের নয়? ব্যাপারটা যেন এইরকম যে, সমাজতান্ত্রিক শিবির দেখবে যে বিশ্বযুদ্ধ লেগে না যায়, মানুষ ধ্বংস হয়ে না যায়। আর, তার কাজ হচ্ছে, অপরের ঘর চড়াও হয়ে যুদ্ধ বাধানো! আর, তাকে রুখতে গেলেই যদি বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায়, আণবিক যুদ্ধ লেগে যায় তবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে অপরের কাজ হচ্ছে নীরবে তার সমস্ত রকমের শয়তানী সহ্য করা এবং তাকে তোষামোদ করা।

আমেরিকা কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের মগজে 'নিউক্লিয়ার' যুদ্ধের আতঙ্কটা খুব ভালভাবেই ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হল। সোভিয়েট নেতৃত্ব আমেরিকার 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিং'-এর রাজনীতির এই চরিত্রটা একেবারে ধরতেই পারল না। তারা এটা ধরতেই পারল না যে, যতক্ষণ সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর আণবিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব আছে, ততক্ষণ আমেরিকা আণবিক যুদ্ধে পা বাড়াতে সাহসই পাবে না। আর, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের এই সমস্ত চক্রান্তগুলোকে বানচাল করাই

তো হচ্ছে আণবিক যুদ্ধ বন্ধ করার কার্যকরী রাস্তা। তা নাহলে, এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তেই যদি একদিন বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়, তখন তো অবশ্যম্ভাবীরূপে আণবিক যুদ্ধ বেধে যাবে। কাজেই শুধু তোষামোদ করে আণবিক যুদ্ধ রোখা যাবে না। তাই আণবিক যুদ্ধ রুখতে হলে গোড়ায় আঘাত করতে হবে, যাতে সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ বাধাবার আয়োজনটাই করতে না পারে। একে বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন — প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেই যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা, যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বাধাবার যে জোট তা গড়ে উঠতে না পারে এবং তার জন্য যা যা করা দরকার সেইগুলো করা। দ্বিতীয়ত, নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাথে খানিকটা যে বিরোধ আছে, সেই বিরোধে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোকে সমর্থন করা এবং এই সমর্থন এমনভাবে করা যাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয় এবং সাম্রাজ্যবাদকে আরও কোণঠাসা করা যায়। তৃতীয়ত, যে সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের জন্য লড়ছে এবং যেসব উপনিবেশিক দেশগুলিতে জনগণ স্বাধীনতার জন্য লড়ছে — সেইসব লড়াইগুলিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে সেইসব দেশের বিপ্লবগুলোকে সফলীভূত হতে সাহায্য করা এবং সেগুলিকে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ থেকে, বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা। এইভাবে সেইসব দেশের বিপ্লবগুলোকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এমন একটা 'ডিপ্লোমেটিক' নীতি অনুসরণ করা, যাতে আমেরিকাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একঘরে (আইসোলেট) করে ফেলা যায়। কারণ, সে আজ আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তি এবং প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমেরিকাই আজ সমস্ত দুনিয়ার যুদ্ধ বিগ্রহের নেতা।

উপরোক্ত এই কার্যক্রমগুলোকে সংযোজিত করা — সোভিয়েট রাজনীতি বা তার পররাষ্ট্রনীতি, বা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। কিন্তু, কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট নেতৃত্ব সেই কাজটি করতে তো পারলই না, উপরন্তু এমন কতগুলো চিন্তাভাবনা (কন্‌সেপশন) নিয়ে এল — যার সঙ্গে এই কাজগুলো সংগঠিত করার কোন সম্বন্ধই নেই। বরঞ্চ , সোভিয়েটের সেইসব চিন্তাভাবনার জন্যই যুদ্ধ পরবর্তী যুগে এই কাজগুলো সংগঠিত করার অনুকূলে যে সুযোগ গড়ে উঠেছিল, তাও ছত্রখান হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল। কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন (ইর্‌রিলিভ্যান্ট কোয়েশ্চন) — যেগুলো তত্ত্বগত চেতনার মান নীচু থাকার সুযোগে ক্রমাগত কমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যে পুঁজিপতিরা ঢোকাবার চেষ্টা করছিল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল — সেইগুলোর শিকার হয়ে গেল সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্ব। এই বিষয়গুলো হল — সোভিয়েট নেতৃত্বের আণবিক যুদ্ধের অমূলক ভয়, আর যেকোন প্রকারে শান্তি বজায় রাখার অতি উৎসাহ। কারণ, তারা বলতে থাকলেন, তা নাহলে বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে এবং বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলেই মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, শান্তি বজায় রাখতে হবে। কিন্তু, শান্তি বজায় রাখা কথাটার মানে কি এই যে, আমেরিকা অপর দেশের ঘর চড়াও হয়ে যুদ্ধ লাগাবে, প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করবে, আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তি চালাবে — কিন্তু, বাধা দিতে গেলে যেহেতু শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে, সেহেতু তাকে সেইভাবে বাধা দেওয়া চলবে না! তাহলে ফলটা কি দাঁড়াবে? ফলটা দাঁড়াবে এই যে, আমেরিকা যা খুশী তাই করে বেড়াবে। — অথচ, তাকে কোন কার্যকরী বাধা দেওয়া হবে না। কারণ, তাকে বাধা দিতে গেলেই তো বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে! কি অদ্ভুত যুক্তি! অথচ ক্রুশ্চেভের যুক্তিধারাটি হচ্ছে ঠিক এইরকম। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আমেরিকাকে রুখতে গেলেই যদি বিশ্বযুদ্ধ হয়? বিশ্বযুদ্ধ হলেই তো আণবিক যুদ্ধ হবে। আর, আণবিক যুদ্ধ হলেই মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর, মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলে কি ছাই-এর ওপর সমাজতন্ত্র হবে? অথচ, বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে ঠিক তার উল্টা। অর্থাৎ, আমেরিকাকে বাধা দিতে গেলেই আণবিক যুদ্ধ লেগে যাবে — এ ধরে নেওয়াটাই হচ্ছে সাবজেক্‌টিভ — অর্থাৎ একটি মনগড়া, মস্তিষ্কপ্রসূত অবাস্তব চিন্তা।

গোড়ায় আমেরিকা এটা ঠিক বুঝতে পারে নি যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ঠিক এইরকমভাবে ভাবছে। আর 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিং'-এর রাজনীতিটা এতখানি কাজ করছে, তা সে গোড়ায় বুঝতে পারে নি। কারণ, সোভিয়েটের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুক্‌নীটা তখনও অটুট ছিল এবং আজও তা আছে। কিন্তু, তার এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতার স্বরূপটা কি, তা গোড়ায় আমেরিকা ধরতে পারেনি। আর, এই ধরতে না পারার ফলে তখন পর্যন্ত সে একরকমভাবে চলছিল। কোরিয়ার যুদ্ধ পরাজয়ের ফলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির

মর্যাদা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যাটম বোমার অধিকারী, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী সমস্ত দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যে দেশ আমেরিকা — কোরিয়ার যুদ্ধে দেখা গেল চীনের ভলান্টিয়াররা লাঠিসোটা দিয়ে পিটিয়ে তাদেরই সিওল পার করে দিল। অপরদিকে ভিয়েতনামে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সৈন্য মরছে — কিন্তু, ৫ ইঞ্চি নিরাপত্তাও সেখানে তারা বাড়াতে পারেনি। বলতে গেলে সেখানে আমেরিকার এখন যায় তখন যায় অবস্থা, শুধু খরচা বাড়াচ্ছে। যত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে, যুদ্ধোপকরণ আছে — সমস্ত প্রয়োগ করে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও অবস্থার কোন উন্নতি করতে পারে নি। এখানেও তার সেই 'প্রেষ্টিজ' রক্ষার লড়াই, মর্যাদা রক্ষার লড়াই। এই মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে সে খানিকটা এ্যাডভেঞ্চারে নেমে গিয়েছিল। কোরিয়ার যুদ্ধের পর তার শক্তি সম্বন্ধে যে ধারণাটা — যেটা একটা 'মিথ' ছাড়া কিছুই না — তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই ধারণাটা পুনরায় ফিরিয়ে আনাও ছিল তার এই অ্যাডভেঞ্চারের একটা উদ্দেশ্য।

সোভিয়েট নেতৃত্বের ভুল আচরণের জন্য
ক্যারিবিয়ানে আমেরিকার হৃত সামরিক গৌবর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল

এই ব্যাপারে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) সে করেছে ক্যারিবিয়ানে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সে বুঝতে চেয়েছে, সোভিয়েটের এই যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধম্‌কি যে ধম্‌কির ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সুয়েজ ক্যানালে প্রথম কাজ করল, আসলে সেই ধম্‌কির প্রকৃতিটা কি ধরণের, ক্রুশ্চেভের এই রাজনীতি চর্চা করতে করতে, তাদের আচার আচরণ দেখতে দেখতে আমেরিকান কূটনীতিবিদদের মাথায় ধাক্কা দিল — তারা ধরে ফেলতে সক্ষম হল যে, আসলে এটা সোভিয়েটের যুদ্ধভীতি, অর্থাৎ তারা ইতিমধ্যেই আণবিক যুদ্ধাতঙ্কের রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়েছে। ফলে, একবার যদি সাম্রাজ্যবাদীরা টের পেয়ে যায় যে, সমাজতান্ত্রিক শিবির যুদ্ধের ভয়ে ভীত, তাহলে যে কাণ্ডটা হবার কথা বর্তমানে তাই হচ্ছে। এবং এই কাণ্ডটি ঘটেছে সোভিয়েটের দুর্বলতার জন্য। ক্যারিবিয়ানে আমেরিকা যে আসলে সোভিয়েটের এই রাজনীতিটাই পরীক্ষা করতে চেয়েছে, ঘটনার এমনই পরিহাস যে, সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ সেটাও ধরতে পারল না। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা একথাটা ধরতেই পারল না যে, এর দ্বারা সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিশ্বের কাছে এমন একটা জায়গায় আমেরিকা নিয়ে আসতে চেয়েছে এবং পরীক্ষা করতে চেয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় কতদূর পর্যন্ত সে যাবে। অর্থাৎ, সে দেখতে চেয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন আঞ্চলিক যুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় নামবে, নাকি আমেরিকার দস্যুবৃত্তি বন্ধ করার জন্য তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ করবে। অর্থাৎ, দরকার হলে এমনকি বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকিও সে নেবে কি? এইটে পরীক্ষা করার জন্যই ক্যারিবিয়ানে আমেরিকা অবরোধ সৃষ্টি করল।

এমনভাবে এই অবরোধটি সে সৃষ্টি কল যে, যুদ্ধের ধম্‌কি দিয়ে যদি সোভিয়েটকে আঞ্চলিক যুদ্ধে নামানো যায়, তবে আমেরিকার সেখানে ভৌগোলিক সংলগ্নজনিত সুবিধা (লগিস্টিক এ্যাডভান্টেজ) আছে এবং সেই কারণে সোভিয়েটকে সেখানে পরাস্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। আর, তা না করে যদি সোভিয়েট এইরকম নীতি গ্রহণ করে যে, সে আমেরিকার সাথে এখানে শুধু আঞ্চলিক যুদ্ধে লিপ্ত হবে না, বরং আমেরিকা এরকম দস্যুবৃত্তি করতে গেলে সে কোনমতেই আমেরিকাকে বরদাস্ত করবে না, তাতে বিশ্বযুদ্ধের ভয় থাকুক আর নাই থাকুক — অর্থাৎ, তা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হবে, (দ্যাট উইল বী কন্‌সিডারড এ্যাজ এ ওয়ার বিটুইন ইউ এস এস আর এ্যাণ্ড ইউ এস এ), তাহলে আমেরিকা গুটিয়ে নেবে। সে তখন শান্তির বুক্‌নি আউড়ে, শান্তির দূত সেজে, বিশ্বশান্তি রক্ষা করার ধূয়াতুলে পিছু হটে যাবে। অর্থাৎ, সোভিয়েটের মনোভাব কি হবে, এইটে পরীক্ষা করার জন্যই — সোভিয়েট কি করে তা দেখবার জন্যই — ক্যারিবিয়ানে এই অবরোধ সৃষ্টি করা হল। আর, আমেরিকা যা আশা করেছিল, ক্রুশ্চেভ একেবারে স্কুলে-পড়ুয়া রাজনীতিবিদ্‌দের (স্কুলবয়, পলিটিসিয়ান) মত সেই কাণ্ডটিই করে বসল।

ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য না বুঝেই ক্রুশ্চেভ প্রথমেই একটা হুমকি দিল। বুঝতেই পারল না যে, হুমকিতে ভয় পাবার জন্য আমেরিকা সেখানে আসেনি। আসলে আমেরিকা জানতে চায়, সোভিয়েটের এই হুমকির দৌড় কতদূর। আমেরিকা বুঝতে চায়, সোভিয়েটের এই হুমকিটা কি এই ধরণের যে, আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজগুলোর সঙ্গে সে ঐ জায়গায় স্থানীয় যুদ্ধে লিপ্ত হবে? তাহলে সোভিয়েটের এই হুমকিতে আমেরিকা

ভয় পাবে না। কারণ ওখানে তার ভৌগোলিক সংলগ্নতাজনিত সুবিধা আছে। ওখানে যুদ্ধ করতে গেলে রাশিয়াই হারবে। আর, যদি এই হুমকিটার মানে এরকম দাঁড়ায় যে, এর ফলে আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ বেধে যাবে, সেক্ষেত্রে আমেরিকার কাছে এই হুমকিটার একটা যথার্থ মানে আছে, তার ভয় পাবার কারণ আছে। কেননা, সেটা হবে বিশ্বযুদ্ধ। আর, অন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেপণাস্ত্রে (আই সি বি এম) তখন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে — অর্থাৎ, সোভিয়েট রাশিয়া অনেক এগিয়ে আছে আমেরিকার থেকে। তার মানে সোভিয়েটের এমন ক্ষমতা রয়েছে যে, রাশিয়ায় বসে পনের মিনিটের মধ্যে বোমা মেরে সে আমেরিকাকে উড়িয়ে দিতে পারে। অন্তর্দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের এক মহাদেশ থেকে অপর মহাদেশে উড়ে যেতে মাত্র পনের মিনিট সময়ের দরকার। এই হচ্ছে অবস্থা। এই অমোঘ অস্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের হাতে রয়েছে।

অথচ, দেখা গেল, সোভিয়েট দিল ধমক, আর আমেরিকাও পাল্টা ডেঁটে গেল। সোভিয়েট প্রথমে বলল, আমরা তাহলে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছি। আমেরিকা বলল, পাঠাও। কারণ, সমস্ত রণনীতিবিদরাই জানেন যে, এর অর্থ আসলে কি দাঁড়াবে। সমস্ত মিলিটারী জেনারেল তৎক্ষণাৎ ক্রুশ্চেভকে পরামর্শ দিল যে, ওখানে আঞ্চলিক যুদ্ধে লিপ্ত হলে রাশিয়া হারবে। হাজার মাইল দূরে থেকে সোভিয়েটকে জাহাজে করে এবং প্লেনে করে সেখানে মালপত্র নিয়ে যেতে হবে — কারণ ভৌগলিক সংলগ্নতাজনিত কোন সুবিধা সেখানে সোভিয়েটের নেই। ফলে, তার পক্ষে এভাবে সেখানে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। একমাত্র যুদ্ধ যেটা হতে পারে, তা হচ্ছে, আণবিক যুদ্ধ। স্থানীয় যুদ্ধ ওখানে হতে পারে না। কারণ, আমেরিকা ওখানে তার ঘাঁটি থেকে যুদ্ধ করবে, ঘাঁটির সঙ্গে তার সংযোগ রয়েছে। আর, সোভিয়েট রয়েছে ওখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। তার পক্ষে পঞ্চাশটা দেশের মধ্যে দিয়ে ডুবো জাহাজে করে মাল নিয়ে গিয়ে ওখানে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তবে সেটা একমাত্র বিশ্বযুদ্ধ হতে পারে, স্থানীয় যুদ্ধ হতে পারে না। ক্রুশ্চেভ বলল, ওরে বাপ্‌রে বাপ্! বিশ্বযুদ্ধ লাগলে তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তো চলবে না। কাজেই আত্মসমর্পণ কর। অর্থাৎ, শান্তির নামে আমেরিকার ঐ রকম দস্যুবৃত্তির কাছে সে আত্মসমর্পণ করল।

এতে একদল 'হামবাগ' খুব হাততালি দিল। বলল, ক্রুশ্চেভ বিশ্বে শান্তির ধ্বজা ওড়ালেন। কিন্তু, এর ফলে মারাত্মক একটা সর্বনাশ হয়ে গেল, যা তারা দেখতে পেলনা। সর্বনাশটা হল এই যে, এর দ্বারা সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে 'আমেরিকান পেন্টাগণ' বা সামরিক বাহিনী সম্পর্কে একটা বিরাট ধারণার সৃষ্টি হল। আমেরিকান সমস্ত শক্তির গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। আমেরিকার যে মর্যাদা ইতিপূর্বে কোরিয়ায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল — তা সে পুনরায় ফিরে পেল। অনেকের মধ্যে এইরকম একটা ধারণার সৃষ্টি হল যে, এইতো আমেরিকারই সত্যিকারের শক্তি — আর, সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তি আসলে ততটা নয়, যতটা তার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, বা বাইরে থেকে যতটা মনে হয়। আমেরিকা ডেঁটে দাঁড়ালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভয়ে মোকাবিলা করার সাহস করে না, ফলে দুনিয়াজোড়া প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধারণা হল যে, আমেরিকা একটি নির্ভরযোগ্য মিত্রশক্তি (এ ডিপেণ্ডেবল এ্যালি)। তাদের বুকের ছাতি অনেকখানি বেড়ে গেল এই ভেবে যে, তাদের বুকে বল ভরসা হিসেবে আমেরিকা তাদের সাথে আছে। কাজেই বিপ্লব, বা জনগণের মুক্তি আন্দোলন, বা অন্য কোনকিছুকে ভয় করবার তাদের কোন কারণ নেই। এইভাবে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এবং পেন্টাগণ মিলিটারি বাহিনীর কাছে আমেরিকার হৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল এবং আমেরিকার যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তা সে পুনরায় ফিরে গেল।

উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার খোলাখুলি আক্রমণ
সোভিয়েট নেতৃত্ব কর্তৃক সমস্ত পূর্বঘোষিত নীতি পদদলিত

কিন্তু, সোভিয়েট সম্পর্কে আমেরিকার এটা ছিল প্রথম পরীক্ষা। ফলে, সে মনে করল, এটাতো এমনও হতে পারে যে, তখনকার ভুলটি সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ত সামলে উঠেছে, বা এইটি তার বরাবরের নীতি (পার্মানেন্ট পলিসি) নাও তো হতে পারে। কাজেই টন্‌কিন্‌-এ এসে সে আবার একটা পরীক্ষা করল। যুদ্ধ হচ্ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে, হঠাৎ করে গানবোট-এর সাহায্যে উত্তর ভিয়েতনামকে সে আক্রমণ করল। টর্পেডো দিয়ে উত্তর ভিয়েতনামের কতকগুলি রণতরী উড়িয়ে দিল। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ভিয়েতনামের উপর

সে প্রথম আক্রমণ শুরু করল যা হয় একটা গল্প বানিয়ে, যা তারা চিরকাল করে। এই আক্রমণ করে প্রথমে সে সোভিয়েটকে বাজিয়ে দেখল। বুঝবার চেষ্টা করল, ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ায়। অর্থাৎ, এটা ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ। কারণ, এটা ঠিক ক্যারিবিয়ানের মত ঘটনা ছিলনা। এক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের একটা ঘোষিত নীতি ছিল যে, যেকোন সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর আক্রমণ সোভিয়েট রাশিয়ার উপর আক্রমণ বলে গণ্য হবে এবং যে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি শেষপর্যন্ত সোভিয়েটের উপরই নির্ভর করে (ডিফেন্স অফ এনি সোস্যালিস্ট কান্ট্রি আলটিমেটলি রেস্টস উইথ ইউ এস এস আর)। কিন্তু, উত্তর ভিয়েতনামের ওপর এই আক্রমণের ঘটনা একথাও প্রমাণ করল যে, আণবিক যুদ্ধাতঙ্কের ভূত সোভিয়েট নেতাদের ঘাড়ে এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, সমাজতান্ত্রিক দেশের এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষিত নীতিকেও তারা এত সহজে পদদলিত করতে পারল।

শুধু তাই নয়, একসময় সোভিয়েটের সাথে চীনের একটা বোঝাপড়া, বা গোপন চুক্তি হয়েছিল — তাতে চীনের আণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করার ব্যাপারে সোভিয়েটের সাহায্য করার কথা ছিল। অথচ, আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা করে সোভিয়েট কথা দিয়ে এল বা চুক্তি করে এল যে, আমেরিকা যদি কথা দেয় যে, তারা আণবিক অস্ত্রশস্ত্র মাটির ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধ করবে এবং তাকে সীমিত (কন্‌ট্রোল) কারার জন্য একটা চেষ্টা চালাবে, তাহলে সোভিয়েট কথা দিচ্ছে চীনকে তারা আণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করবে না। এমনকী, এর দ্বারা চীনের সাথে সোভিয়েটের যে গোপন চুক্তিটি হয়েছিল, তাও তারা ফাঁস করে দিয়ে এল। এই চুক্তির অর্থ কি দাঁড়াল? এখানে তো সোভিয়েট, মানবতাবাদীদের মত বা একজন ধর্মযাজকের (প্রিস্ট) মত আচরণ করল — রাজনীতির ক্ষেত্রে যার কোন মূল্য নেই। এটাকে সোভিয়েটের একটা চূড়ান্ত অজ্ঞতা, আর না হয় একটা চূড়ান্ত দালালি বলা যেতে পারে — সে যাই হোক্ — বাস্তব রাজনীতিতে ফল তার এক। আমেরিক এর পুরো সুযোগ নিল। আমেরিকার কাছে এইভাবে গোপন চুক্তি ফাঁস করে দেওয়ার জন্য চীনকে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র না দেওয়ার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়ে আমেরিকার সাথে এরকম একটা চুক্তি করে আসার জন্য — যার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্ষতি এবং অনিষ্ট হবে সবচেয়ে বেশী — চীন যখন পরে সোভিয়েটকে চেপে ধরল, তার উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন বলল, চীনের আণবিক অস্ত্রশস্ত্র বানাবার দরকার কি? সোভিয়েট ইউনিয়নেরই তো আণবিক শক্তি রয়েছে। ফলে, অনর্থক তার শক্তি অন্যদিকে পরিচালিত করে বা বিকেন্দ্রীকরণ করে কি হবে? বরং সে চীনকে বোঝাতে চাইল যে, তার সমস্ত শক্তি সে কেন্দ্রীভূত করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োগ করুক, যাতে একটা পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে। ফলে, দেশের উন্নতি হবে দ্রুত। আর, আণবিক শক্তি, যেটা সোভিয়েটের আছেই — সেটাই সকলে মিলে ব্যবহার করবে।

তখন এরকম একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও ক্রুশ্চেভের মাথায় ঘুরছিল যে, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে কতকগুলো সেক্টরে ভাগ করা হবে। অর্থাৎ, কতকগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশে শিল্প কেন্দ্রীভূত হবে, আর কতকগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশ থাকবে কৃষিভিত্তিক। কিন্তু, ক্রুশ্চেভের এই পরিকল্পনা কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রহণ করবে না, করতে পারে না। কারণ, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশেরই একটা জাতীয় মানসিকতার রূপ (ন্যাশনাল সাইকোলজিক্যাল মেকআপ) রয়েছে — সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে, প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আলাদা আলাদা ভাবে অবস্থান করছে। বিষয়টা তো এরকম নয় যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জাতীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য শেষ (এক্‌জস্টেড) হয়ে গেছে এবং বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং, নিজ নিজ জাতীয় মানসিকতা নিয়ে জাতীয় সীমার গণ্ডীর মধ্যেই আজ প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আলাদা আলাদা অবস্থান করছে। এই বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কাজেই এই অবস্থায় কোন সমাজতান্ত্রিক দেশই তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা অপর দেশের হাতে তুলে দিতে পারে না। (ক্যান নট স্যাক্‌রিফাইস ইট্‌স ইকনমিক পাওয়ার টু আদারস্)। সোভিয়েটের কাছে থাকবে ইস্পাত তৈরীর সমস্ত যন্ত্রপাতি, উন্নত কলকারাখানা — আর, অন্যরা শুধু চাষবাস করবে, আর শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করবে — এই প্রস্তাবে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাজী হবে? কেউই রাজী হবে না, এবং বাস্তবেও তাই হল — কেউ রাজী হ'ল না।

কারণ, এ ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে অনেক পরে। যখন বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হবে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের লোপ হবে জাতীয় গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকভাবে কেন্দ্রীভূত এক মানবসমাজ গড়ে উঠবে — তখনই কেবলমাত্র এরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে — তার আগে

নয়। তার আগে এ ধরণের জবরদস্তি করতে গেলেই সকলে এটাকে খবরদারি বলে মনে করবে, সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠত্বকে সকলে সন্দেহের চোখে দেখবে। বাস্তবে সমস্ত "বলকান" রাষ্ট্রগুলোর (বলকান স্টেটস্) মধ্যেই সোভিয়েট সম্পর্কে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। চীনের মধ্যেও মাথাচাড়া দিয়েছে এবং এ জিনিস দেবেই। এই সন্দেহের বাস্তব কারণও রয়েছে। কারণ, ক্রুশ্চেভের এই পরিকল্পনার সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বর্তমানে যে স্তরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে — এই পরিকল্পনার মধ্যে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেনি। কাজেই ঐ রকম অবাস্তব পরিকল্পনা কারুর পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

আণবিক শক্তিতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখাই আণবিক যুদ্ধ বন্ধ করার একমাত্র গ্যারান্টি

ফলে, যে কথা বলছিলাম, সোভিয়েট আণবিক বোমা তৈরীর প্রশ্নেও চীনকে ঐ একই কথা বলল। চীন তখন তাকে বলেছিল যে, প্রথমে সোভিয়েট একটা অপকর্ম করেছে, আবার আর একটা অপকর্ম করে এসেছে। প্রথম অপকর্মটি হ'ল এই যে, হঠাৎ একটা বাহাদুরী জাহির করতে গিয়ে সোভিয়েট আমেরিকাকে বলে এল যে, সোভিয়েট আর আণবিক বোমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে না। সঙ্গে সঙ্গে রাজাগোপালাচারীর মত কিছু প্রগতিশীল(!) লোক বাহবা দিয়ে বললেন যে, এতদিনে একটা মানবিক কাজ হয়েছে। আর এই ফাঁকে আমেরিকা — যে সামরিক শক্তিতে রাশিয়ার থেকে পিছিয়ে ছিল — রাশিয়ার সাথে তার এই ফাঁকটা পূরণ করার জন্য চুপচাপ পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে গেল। কিছুদিন বাদেই এই ভুলটা ধরা পড়ল। চীন বলল (তখনও চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়নি) যে, এ কী সর্বনাশা নীতি সোভিয়েট অনুসরণ করে চলেছে! যে কারণে সোভিয়েট আণবিক শক্তির পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধ করেছে, সাম্রাজ্যবাদীরা সে ব্যাপারে এক পাও এগোবে না। তারা শুধু একদিকে সোভিয়েটকে 'হিউম্যানিষ্ট' আখ্যা দিয়ে বাহবা দেবে এবং হাততালি দেবে, আবার একই সাথে আণবিক শক্তিতে সোভিয়েটের সঙ্গে তার যে পার্থক্য রয়েছে, তাকে কত দ্রুত পূরণ করা যায় তার চেষ্টা সে করবে। আর যে মুহূর্তে এই ফাঁক পূরণ হয়ে যাবে এবং কোন সময়ে সে যদি আণবিক শক্তিতে সোভিয়েটকে ছাড়িয়ে যেতে (সুপারসিড) পারে, তখন এইসব মানবতার কোন বুক্নির কোন মূল্যই তার কাছে থাকবে না — তখন সত্যিকারের আণবিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আজ যে সে যুদ্ধ লাগাচ্ছে না, তার অন্যতম প্রধান কারণ, আণবিক শক্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়নেরই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আমেরিকা জানে যে, সোভিয়েট আজ একটা চড় মারলে সে নিজেই উড়ে যাবে। আর, এটাই হচ্ছে যুদ্ধকে রুখবার যথার্থ গ্যারান্টি। কারণ, যতক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ আছে, যুদ্ধবাজরা (ওয়ার ম্যানিয়াকস) আছে, সামরিক শাসনব্যবস্থা (মিলিটারি রেজিম) আছে, অর্থনীতির সামরিকীকরণের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো চলছে, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধের বাস্তব সম্ভাবনা বর্তমান (ওয়ার ইজ এ রিয়েলিটি) — সেইখানে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকছে। সুতরাং আণবিক শক্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শ্রেষ্ঠত্বই (সুপিরিয়রিটি) হল এই যুদ্ধ বন্ধ করার অন্যতম প্রধান গ্যারান্টি। ফলে চীন বলল — সোভিয়েট কেন আণবিক পরীক্ষা বন্ধ করেছে? সোভিয়েটের আমেরিকাকে শুধু এই কথাই বলা উচিত ছিল যে, সোভিয়েট সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধ করতে, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ভেঙ্গে ফেলতে রাজী আছে, আমেরিকা যদি সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করতে রাজী থাকে। সেজন্য সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ (কমপ্লিট এ্যাণ্ড অলআউট ডিস্আরমামেন্ট) — আণবিক পরীক্ষানিরীক্ষা শুধু নিয়ন্ত্রণ নয়, সমস্ত আণবিক অস্ত্র ধ্বংস করার কথা বলা উচিত ছিল। চীন শুধু আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে আপত্তি করছে এই কারণে যে, এই ফাঁকে আমেরিকা আণবিক শক্তিতে সোভিয়েট থেকে যতটা পিছিয়ে ছিল, সেটা পূরণ করার চেষ্টা করবে। আর, বিজ্ঞানের অগ্রগতিটা এমন হয়না যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন যেহেতু আজ এ ব্যাপারে এগিয়ে আছে, সেই এগোনোটা সে বারবার বজায় রেখে চলবে। এমন চিন্তা অবৈজ্ঞানিক। এর উত্থান-পতন হতে পারে। তাই এ সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বক্ষণের সতর্কতা দরকার, যেন এক ইঞ্চি ও কোন সময়ে আমেরিকার কারিগরী এবং আণবিক বিজ্ঞান থেকে সে পিছিয়ে না পড়ে। তা নাহ'লে যে কোন মুহূর্তে বিপদের সৃষ্টি হতে পারে। চীনের ধম্কাধম্কীতে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর চাপে তখনকার মতো সোভিয়েট ইউনিয়ন এটা মেনে নিল। কিন্তু, মেনে নিলেও ভেতরে ভেতরে বিরোধটা রয়ে গেল।

চীনকে যখন সোভিয়েট আণবিক অস্ত্র না তৈরী করার জন্য চাপ দিল, তখন চীন রাজী হয়নি। কারণ,

তখনই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অনেকের মনের মধ্যেই এই আশঙ্কা ঢুকেছিল এবং তাদের অনেকেরই এই আশঙ্কা ছিল যে, যে রাস্তায় সোভিয়েট ইউনিয়ন পা দিচ্ছে — তাতে ইচ্ছায় হোক্, আর অনিচ্ছায় হোক্, সত্যিই একদিন যুদ্ধের বিপদ এসে যাবে। কেননা, 'যুদ্ধ চাইনা' 'চাইনা' করে মন্ত্র পড়লে তো আর যুদ্ধ বন্ধ হবে না! অর্থাৎ চীনের বক্তব্য হচ্ছে, সোভিয়েটের 'যুদ্ধ চাইনা' ভাবটা হচ্ছে অনেকটা 'যুদ্ধ চাইনা' বলে উপোস করা আর মন্ত্র পড়ার রাস্তার মতো। অথচ, সত্যিকারের বিপ্লবীদের কাছে 'যুদ্ধ চাইনা' কথাটার অর্থ হ'ল, এমন একটা বাস্তব রাজনীতি এবং কর্মপন্থার অনুসরণ, যে রাজনীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণের ফলে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ লাগাবার উপকরণগুলো এবং আয়োজনগুলোই বানচাল হয়ে যাবে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলো জয়যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমাগত কোণঠাসা হতে থাকবে। অর্থাৎ, যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাতে চালাতেই সাম্রাজ্যবাদ দেখবে যে পূর্বে সে যতটুকু প্রস্তুত ছিল, তার চেয়ে আরও খারাপ আবস্থার মধ্যে সে পড়ে গেছে। এর মানে হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদকে এমন একটা অবস্থায় ফেলতে হবে — যাতে সে শুধু একটার পর একটা পরিকল্পনা করতে থাকবে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনগুলো জয়যুক্ত হয়ে যাবে — এ ধরণের বাস্তব রাজনীতি গ্রহণ করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে চেষ্টা করতে থাকবে একে 'ম্যানেজ' (হাত করা) করা, তাকে 'ম্যানেজ' করা, এখানে ফাঁক পূরণ (গ্যাপ মেক-আপ) করা, ওখানে ফাঁক পূরণ করা, অন্যদিকে দেখবে যে কয়েক বছর যেতে না যেতেই অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে — 'ম্যানেজ' করতে করতে অন্যদিকে ফাটল ধরে গেছে। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে এদেশ বেরিয়ে গেছে, ঐ দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে, সে দেশ তাদের আওতা থেকে বেরিয়ে গেছে, অর্থনৈতিক সঙ্কট চরম অবস্থায় পৌঁছেচে। এইভাবে নানা দিক থেকে সমস্ত আন্দোলনগুলোকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে এমন দুর্বল করে দেওয়া, যাতে যুদ্ধ বাধাবার তাদের সমস্ত চক্রান্তটাই বানচাল হয়ে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েটের কাজ হচ্ছে ঃ

প্রথমত, উপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে জনগণের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করা;

দ্বিতীয়ত, উপনিবেশিক দেশগুলির এইসব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে পরস্পর সংযোজিত করা;

তৃতীয়ত, উপনিবেশক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক সমস্ত দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শান্তি আন্দোলন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করা এবং সাম্রাজ্যবাদের 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিং' রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া;

চতুর্থত, সাম্রাজ্যবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির এবং নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির নিজেদের অভ্যন্তরে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ করা — সতর্কতার সাথে এগুলোকে লক্ষ্য করা এবং ব্যবহার করা — অর্থাৎ, এই দ্বন্দ্বগুলোর সুযোগ এমনভাবে নেওয়া উচিত যাতে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমাগত আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

এইভাবে উপরোক্ত কার্যক্রমগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একটার পর একটা দেশে বিপ্লব ঘটানোর দ্বারা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে এমনভাবে কোণঠাসা করা, যাতে যুদ্ধ লাগানোর পরিকল্পনা করতে করতেই সে খতম হয়ে যায়। এই হল যুদ্ধের হাত থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করার বাস্তব রাস্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় এই বাস্তব পরিস্থিতির, অর্থাৎ যুদ্ধ লাগাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করতে করতেই দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে খতম করে দিয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতো বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত কাজগুলি সবটা যদি নাও করা যায়, অন্ততঃ কতকগুলো পুঁজিবাদী দেশকে সমস্ত দেশের বিপ্লবী আন্দোনগুলোর দ্বারা সেই সংগ্রামগুলির সফলতার দ্বারা এমনভাবে পরিবেষ্টিত করে ফেলা, যে পরিবেষ্টনের দ্বারা সে অবরুদ্ধ হয়ে যায়, যাতে আর তার যুদ্ধ লাগাবার ক্ষমতা না থাকে — এমন ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এটাই হ'ল যুদ্ধ বন্ধ করার বাস্তব পন্থা। অথচ, ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব নিলেন উপোস এবং আবেদন-নিবেদনের রাস্তা, কতগুলো শুকনো মেকী, কথা যা শয়তান বা বাঘ শোনে না।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী হচ্ছে হাড়ে হাড়ে শয়তান। আর, মনে রাখা দরকার, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় কোন একজন শাসক ব্যক্তিগত ভাবে যদি শয়তান নাও হয়, তবু যুদ্ধের আয়োজন করা ছাড়া তার উপায় নেই। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি তাকে সেদিকে ঠেলে দেয়। এখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকটি — ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন অবান্তর। একজন লোক ব্যক্তিগত ভাবে ভাল হতে পারে, সৎ হতে পারে। কিন্তু, সে ঐ শাসনব্যবস্থা ভালভাবে চালাতে পারবে না। সামরিক অধিনায়করা, বা তার দেশের যুদ্ধ বাজরা, অর্থাৎ বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাকে পছন্দ করবে না, যদি সে যুদ্ধ অর্থনীতিকে মদত না দেয়, 'ওয়ার ইকনমিককে বুস্ট' না করে। সে মানবিক বলে, 'ফ্লেক্সিব্‌ল্' বলে রাজনীতিতে যে নীতিই গ্রহণ করুক, যদি অর্থনীতিকে মূলতঃ যুদ্ধ অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে না পারে, তাহলে তারা তাকে ফেলে দেবে। কারণ, আসল ক্ষমতাটা তারাই কন্ট্রোল করছে। এখানে কোন ব্যক্তিকে পরোয়া করলে তাদের চলে না। ফলে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে একজন শাসক যদি ভালো, মানবিক গুণের অধিকারীও হয়, তাতে কি হবে? এই ব্যবস্থায় সে নিরুপায়, তার কোন ক্ষমতাই নেই। হয় তাকে এই ব্যবস্থার সেবা করতে হবে, আর তা যদি সে না করতে পারে, তবে তাকে ক্ষমতা থেকে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্যিকারের ক্ষমতাটা যারা কন্ট্রোল করে, তারা তাকে সহ্য করবে না। তাকে ক্ষমতা থেকে ফেলে দেবে। হয়ত আর একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়ে যাবে, কিন্তু সে ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। অর্থাৎ, শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা সে রাস্তায় যাবার সে রাস্তায়ই যাবে।

ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরবর্তী অবস্থায় এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমি একসময় বলেছিলাম যে, বিশ্ববিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের দরজায় আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম, দশ গজের মধ্যে এসে গিয়েছিলাম। এমন সময় আমাদের কানামাছিতে ধরল। অর্থাৎ, অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম যে, দেশে দেশে বিপ্লব সফল হতে যাচ্ছে এমন উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তো তখন একেবারে যুদ্ধ বিধ্বস্ত। তারা তখন ক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন (বিলো ইন্‌স্টল্‌ড ক্যাপাসিটি প্রোডিউস) করছে। দেশের মানুষকে তারা খেতে দিতে পারছে না। ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের জোয়ার বইছে। সেখানে আগের মত তারা লুঠ করতে পারছে না। ফলে, নিজ নিজ দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে তারা সন্তুষ্ট রাখতে পারছে না। যে বিদেশের বাজারকে লুঠ করে তারা এতদিন তাদের দেশের শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে এসেছিল এবং তার ফলে দেশের মধ্যে যে আপাতঃ প্রশান্তিটা ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জোয়াল থেকে বহু দেশ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে এবং সেইসব দেশে নতুন নতুন শিল্পোদ্যাগ হওয়ার ফলে, সেইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় তার চাপ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির উপর বর্তাল। বাস্তবে আমেরিকার সমস্ত অর্থনীতিটা একেবারে বালুর চরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অবস্থাটা এইরকম যে, যেকোন মুহূর্তে তা ধ্বসে পড়ল বলে। যুদ্ধ অর্থনীতির উপর তার পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে যে যুদ্ধের ওপর সে তার যুদ্ধ-অর্থনীতির স্থায়িত্বটি টিকিয়ে রেখেছে তার প্রকৃতিটা এরকম যে, সে যুদ্ধ একটা স্থানীয় ব্যাপার, একটা আংশিক ব্যাপার বা একটা সাময়িক ব্যাপার — এ চিরকালের জন্য স্থায়ী হতে পারে না। আর এই স্থানীয় যুদ্ধগুলোকে সে টিকিয়েও রাখতে পারছে মূলতঃ আজ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলো জয়যুক্ত হয়নি বলেন। ফলে, যে মুহূর্তে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলো সফল হয়ে যাবে, সে মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে স্থানীয় যুদ্ধ লাগাবার ক্ষমতাও কমে আসবে। কাজেই সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কাজ ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া।

শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নীতির যথার্থ বৈপ্লবিক তাৎপর্য এবং তা অনুধাবনে বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্বের ব্যর্থতা

এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রশ্নটি এসেছিল কেন? সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করে যে, কমিউনিস্টরা জোর করে দুনিয়ার ওপর কমিউনিজম চাপাচ্ছে। তার উত্তরেই স্ট্যালিন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের (পিসফুল কো-এসজিস্‌টেনস্) তত্ত্বটিট উপস্থাপিত করেছিলেন। যুদ্ধের মারফত কমিউনিস্টরা বিভিন্ন দেশে জবরদস্তি কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চায় — সাম্রাজ্যবাদীদের এই প্রচারের জবাবে স্ট্যালিন বলেছিলেন, এটা একটা মিথ্যা প্রচার। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই তত্ত্বে বিশ্বাসই করেনা। তাছাড়া যুদ্ধের পর আমেরিকা আর একটা চীৎকারও শুরু করেছিল যে, তাদের অস্তিত্ব বিপদের সম্মুখীন — কমিউনিস্টরা নাকি তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন

করছে। তাই সোভিয়েটকে রোখা ছিল তখন তার নীতি। তার উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন বলেছিল যে, — না, সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বারা তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন — একথা ঠিক নয়। সোভিয়েটের সামরিক শক্তির দ্বারা তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন নয়। বলেছিল, সমাজতান্ত্রিক শিবির এই সাদা কাগজে সই করে (ব্ল্যাঙ্ক চেক) দিচ্ছে, সোভিয়েটকে আক্রমণ না করলে সোভিয়েট কারোর গায়ে হাতও দেবেনা এবং কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যাবেনা। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদীদেরও এতে সই করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। তাদের বলতে হবে, তারা জোর করে কোন দেশের জনগণকে ঠেঙ্গাতে যাবেনা, কোন দেশের ওপর আক্রমণ চালাবেনা এবং অপর দেশের ঘর চড়াও হবে না। তাহলে তাদের সাথে কোন বিরোধ সোভিয়েটের থাকবেনা এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ রুখবার জন্য সোভিয়েটের কোন দেশে যাওয়ার দরকার হবেনা। অর্থাৎ, এর নামে দাঁড়াবে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কারোর হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

কারণ, কমিউনিস্টরা জানে বিপ্লবটা বাইরে থেকে আমদানী করে হয়না। দেশের ভিতরের শক্তি যদি বিপ্লবের অমোঘ শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে বাইরের উস্কানিতে বড়জোর কিছুদিন বিপ্লবের নামে বাঁদর নৃত্য পারে, কিন্তু বিপ্লব হবেনা। একটা দেশে তখনই বিপ্লব হয়, যখন দেশের মানুষকে তা আকর্ষণ করে এবং দেশের জমি থেকে রস সংগ্রহ করে তা দানা বাঁধে। একমাত্র এইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেই একটা দেশে বিপ্লব হয়। বাইরের সাহায্য তখন তাকে আরও শক্তিশালী করে — এই পর্যন্ত। কিন্তু, নিজের দেশের জমিতে সে যদি রস সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে কোন দেশের বিপ্লবী শক্তিই অমোঘ শক্তির অধিকারী হতে পারে না। যেমন ভিয়েতনামের যে বিপ্লবী শক্তি, তা বাইরের সাহায্যের দ্বারা পুষ্ট শক্তি না। তাই যদি হত, তাহলে সামরিক শক্তির দ্বারা দুদিনেই তাকে তছনছ করে দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু, তা করা যায়নি। কারণ, সেখানকার বিপ্লবটা নিজের দেশের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে গড়ে উঠেছে। সেখানে নয় বছরের ছেলেটা রাইফেল কাঁধে করে বেরিয়ে যাচ্ছে — মা, ছেলে, মেয়ে, সকলেই রাইফেল কাঁধে করে বেরিয়ে পড়ছে। তারা ক্ষেতে চাষ করছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের রাইফেল দিয়ে গুলি করে প্লেন ফেলছে। ফলে, এটা কি বিদেশের থেকে আমদানী করা বাঁদরের লাফানির মত বিপ্লব নাকি? এর মূল হচ্ছে একেবারে দেশের জমিতে। সেখানে মানুষের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, বিপ্লবী চেতনায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছে। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, ভিয়েতনামের এই মুক্তি আন্দোলনকে সোভিয়েট সমর্থন করে, সমাজতান্ত্রিক শিবির সমর্থন করে, এবং দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল মানুষ, মুক্তিকামী মানুষই সমর্থন করে।

কিন্তু, ভিয়েতনামের জনগণের এই মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করা কি ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা? এটা তো একটা সাধারণ কথা যে, জ্ঞান বা তত্ত্বের যেমন কোন দেশ নেই, জাতি নেই — তেমনি প্রগতির আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিরও কোন দেশ বা জাতি নেই। যেমন ধরুন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই কংগ্রেসীরাই একদিন জওহরলালের নেতৃত্বে ভলান্টিয়ার পাঠাতে চেয়েছিল। সেটা তো স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ছিল। তবে তারা স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে চেয়েছিল কেন? কারণ, ওটা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানুষের প্রগতির সংগ্রাম ছিল। সমস্ত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীনতাকামী সমস্ত মানুষেরই সাহায্য করার কথা — যারাই সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্য একদিন লড়েছে এবং লড়ছে তাদেরই সাহায্য করার কথা — যারা স্বাধীনতাকে আজও মূল্য দেয় তাদেরই করার কথা। কিন্তু, স্বাধীনতা কোথাও শুধুমাত্র অপরের সাহায্যে অর্জিত হয়না। প্রত্যেক দেশই নিজেদের স্বাধীনতা নিজেরাই অর্জন করে। তবে যেখানে যেখানে স্বাধীনতার জন্য লড়াই হবে — কেউ যদি নিজে স্বাধীনতা চায় — সেই স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর প্রতি তার মমতা ও সমর্থন থাকবে। কেউ পারলে তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু, কোন দেশের স্বাধীনতা অপরে এসে অর্জন করে দিতে পারেন। তাদের স্বাধীনতা তাদেরই অর্জন করতে হবে — তারাই লড়বে। তারা যখন দেশের জমি থেকে শক্তি সঞ্চ য় করতে পারবে, তখনই তা হবে দুর্লঙ্ঘ।

কমিউনিস্টদের এই হচ্ছে তত্ত্ব। আর, এই উপরেই কমিউনিজমের একটা মূল তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। তা হচ্ছে, বিপ্লব আমদানী করা যায়না, বা রপ্তানী করা যায় না। এর পিছনে মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটা বুনিয়াদী তত্ত্ব রয়েছে। তা হল, যে কোন বস্তুর পরিবর্তনের মূল কারণ তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব — বর্হিদ্বন্দ্ব তাকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে মাত্র। কিন্তু, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব পরিপক্ক (ম্যাচিওর) না হলে, অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ অবস্থা তৈরী না হলে কোন পরিবর্তন বা বিপ্লব হতে পারেনা। তাই বিপ্লবের জন্য ব্যস্ত হয়ে সাততাড়াতাড়ি ওপর দেশের উপর হামলা করার কমিউনিস্টদের দরকার নেই। কারণ, বাইরে থেকে মিলিটারী অপারেশানের

দ্বারা বিপ্লব হবে — অর্থাৎ যারা ট্রটস্কিপন্থী যারা বাইরে থেকে বিপ্লব আমদানী করার কথা বলে — মার্ক্সবাদ তার পরিপন্থী। মার্ক্সবাদে এ তত্ত্বের কোন স্থান নেই। স্ট্যালিনের চিন্তার মধ্যে এ ধারণাটা ছিলনা, চীনের মধ্যেও নেই। কোন সত্যিকারের কমিউনিস্টদের মধ্যেই নেই। এটা ছিল ট্রট্স্কির পরিকল্পনা। ট্রট্স্কির বক্তব্য ছিল, কোন দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তার প্রাথমিক কাজ হবে সৈন্য দিয়ে দেশে দেশে বিপ্লব রপ্তানী করা। অর্থাৎ, তার ছিল 'পার্মানেন্ট রেভোলিউশান'-এর তত্ত্ব। কিন্তু, তার বিরুদ্ধে লেনিনীয় তত্ত্ব, বা মার্কসবাদী তত্ত্ব যেটা এল, তা হচ্ছে এই যে, এভাবে ঘর চড়াও হয়ে বিপ্লব করতে গেলে, দেশে দেশে জনসাধারণের মধ্যে যে স্বাধীনতার মনোভাবটা রয়েছে সেটাকেই বুর্জোয়ারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে। তারা এটাকে আক্রমণ বলে ব্যাখ্যা করবে এবং তার ফলে দেশের মধ্যে যারা স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবের জন্য তৈরী হচ্ছিল, তাদের সেই বিপ্লবী আন্দোলনটাই মার খেয়ে যাবে। এ বিপ্লবের নামে উগ্রতা, বিপ্লবের রাস্তা নয়। এখানে আর একটা কথাও বলে যাওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। তা হচ্ছে, এই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতির স্রষ্টা ক্রুশ্চেভ নয়। লেনিনীয় শিক্ষার ভিত্তিতে স্ট্যালিনের আমলেই এই তত্ত্বের সৃষ্টি। ক্রুশ্চেভ এই তত্ত্বকে অধঃপতিত (ডিগ্রেড) করেছে। অথচ, ক্রুশ্চেভ এমন একখানা ভাব দেখাচ্ছেন যেন তিনিই প্রথম এই তত্ত্বটির জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ছাত্রদের এইসব কথা বলে ঠকানো যাবেনা। তারা জানেন, এ তত্ত্বের স্রষ্টা ক্রুশ্চেভ নন, এ তত্ত্বের স্রষ্টা স্ট্যালিন।

তাহলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি এল সাম্রাজ্যবাদীদের জবাব দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ, এর দ্বারা সোভিয়েট দুনিয়ার জনসাধারণের কাছে একথাই বলতে চাইল যে, সোভিয়েট শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করার জন্য তৈরী, আমেরিকাকে অনুসরণ করতে বলা হোক্। আমেরিকা যেমন স্বাধীনতা রক্ষার নামে ছুটে যাচ্ছে, সোভিয়েট কি সেরকম স্বাধীনতা রক্ষার নামে হোক্, প্রতিক্রিয়াকে দমন করার নামে হোক্, কোথাও ছুটে যাচ্ছে? সোভিয়েট কি আমেরিকার মত কোন দেশে সৈন্য পাঠিয়েছে, বা কোন দেশ চড়াও হয়ে বম্বিং করেছে? এমনকী, আমেরিকা যে স্বাধীনতা রক্ষা করতে যাচ্ছে বলে বলছে, সোভিয়েটের মতে তা চরম প্রতিক্রিয়াশীল কাজ হওয়া সত্ত্বেও তাকে দমন করতেই বা সোভিয়েট কোথায় ছুটে যাচ্ছে? আর, তাছাড়া আমেরিকাকে বিশ্বের স্বাধীনতা রক্ষার প্রহরী কে নিযুক্ত করেছে? ফলে, সোভিয়েটের বক্তব্য ছিল প্রত্যেক দেশের জনসাধারণকে তাদের নিজেরে ভাগ্য, নিজেদের নির্ধারণ করতে দেওয়া হোক্। কোন্ দেশ কমিউনিস্ট হবে, কোন্ দেশে মার্কিনী গণতন্ত্রের আদর্শকে ধ্বজা করে চলবে, অর্থাৎ কোন্ দেশ কী করবে না করবে, তা তারা নিজেরাই ঠিক করুক। দেশে দেশে মালিক-মজুরের যে লড়াই চলছে, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যে যে লড়াই চলছে, সেই লড়াইগুলোতে প্রতিটি দেশের জনসাধারণকে তার তার দেশের শোষক বা মালিকদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে দেওয়া হোক্। সাম্রাজ্যবাদীরা গণতন্ত্র রক্ষার নাম করে যেন অপর দেশে চড়াও না হয়। সোভিয়েটের এমনিতেই যাওয়ার দরকার নেই, সে লিখে দিচ্ছে। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদীরা মেনে নিক যে, তারা অপরকে আক্রমণ করবে না।

প্রথম যখন স্ট্যালিন এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির কথা বলেন আমাদের বেশ মনে আছে, সেই সময় আমাদের দেশের যারা ট্রট্স্কিপন্থী তাঁরা বলেছিলেন, এ তো শ্রেণীসমন্বয়ের (ক্লাস কোলাবোরেশন) নীতি। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে, ফ্যাসিস্টদের সাথে, পুঁজিপতিদের সাথে, আবার শান্তিপূর্ণ সহবস্থান কি? তাঁদের মতে এ নীতি শ্রেণীসমন্বয়ের নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এই কথার উত্তরে বলেছিলাম, তাঁরা শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নীতির অর্থই কিছু বোঝেননি। তাঁরা তো সেই 'পার্মানেন্ট রেভোলিউশন'-এর ছাত্র। আবার যাঁরা আজ 'পার্মানেন্ট রেভোলিউশন'-এর কথা বলেন, আবার কালই কমিউনিজমের বিরোধিতা করতে গিয়ে 'আমেরিকান ফ্রি সোসাইটি'র সভ্য হয়ে আসেন — আর হয়েছেনও তাই। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি শ্রেণীসমন্বয়ের নীতি নয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি আসলে হচ্ছে দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবের সংগঠিত আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত রাখা, আর শান্তিকে গ্যারান্টি করার একটি বাস্তব সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রম (অব্জেকটিভ সোস্যালিস্ট এ্যাপ্রোচ)। এ এমন একটা নীতি — যে নীতির পক্ষে বুর্জোয়া দেশের জনসাধারণও সাড়া দেবে, এমনকি পুঁজিপতিদের মধ্যেও একদল লোক সাড়া দেবে। অপরদিকে পুঁজিপতিদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধবাজ, যুদ্ধোন্মাদ, তারা একেবারে চূড়ান্তভাবে কোণঠাসা হয়ে যাবে। এ নীতির মজা হচ্ছে এমন যে, বিভিন্ন দেশে যারা কমিউনিজমের কথা ভাবেনা, কিন্তু যুদ্ধ চায়না — সেই শক্তিগুলিও দেশে যদি যুদ্ধ বাধে, তাহলে তাকে রুখবে। তারা শান্তিপূর্ণ

সহাবস্থানের নীতি মেনে নেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর চাপ দেবে। কমিউনিস্টরা অস্তিত্ব বিপন্ন করছে বলে যে ধূয়া সাম্রাজ্যবাদীরা তুলছে, তার উত্তরে তারাই সাম্রাজ্যবাদীদের বলবে, সমাজতান্ত্রিক শিবির তো সাদা কাগজে লিখে দিচ্ছে যে, অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করবে না, তাহলে সাম্রাজ্যবাদীরা খোলাখুলি তাকে আক্রমণ করছে কেন? আমেরিকার সি আই এ-ই বিভিন্ন দেশে উস্কানী দিয়ে বেড়াচ্ছে — এ অভিযোগ তারাই তুলবে।

সমাজতান্ত্রিক শিবির যেমন আদর্শের প্রচার করে, তেমন আদর্শের প্রচার সাম্রাজ্যবাদীরাও করুক। কিন্তু, আমেরিকা তা করছে না। সে সি আই এ-র এজেন্ট পাঠিয়ে দেশে দেশে 'ক্যাশ এ্যাণ্ড ভায়োলেন্স'-এর নীতি অনুসরণের দ্বারা অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নাক গলাচ্ছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবির সম্পর্কে এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তারা উপস্থিত করতে পারেনি। অথচ, তারা মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, সি আই এ-র মত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও পঞ্চ ম বাহিনী সৃষ্টি করে কাজ করছে। এটা সম্পূর্ণভাবে একটা জঘন্য রাজনৈতিক মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভিন্ন দেশে যারা কমিউনিজমের আদর্শে বিশ্বাস করে এবং তা প্রচার করে তাদেরই তারা পঞ্চ ম বাহিনী বলে। আমি প্রশ্ন করতে চাই, কোন আদর্শ মেনে চলা কি দালালি করা? তাই যদি হয়, তবে তো গণতন্ত্রের ধারণা গ্রহণ করার দ্বারা আমরাও হয় আমেরিকার, না হয় ব্রিটেনের দালালি করছি। অথবা, আমরা যখন ইলেক্‌ট্রিসিটি ব্যবহার করি, তখন আমরা বিদেশের দালালি করি। কারণ, বিদ্যুৎ তো আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেননি। এইভাবে যাঁরা যুক্তি করেন, তাঁদের কি বোঝানো যাবে যে, বিজ্ঞানের যেমন কোন জাত নেই, কোন দেশ নেই, তেমনই তত্ত্বের এবং দর্শনের বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন জাত বা দেশ থাকে না। কমিউনিজম একটা মতাদর্শ — তার আবার দেশ বা জাতি কি? এই মতাদর্শ যাদের ভাল লাগবে, তারা নেবে। রাশিয়া যখন কমিউনিজমের এই মতাদর্শ প্রথম গ্রহণ করে, তখন তাকে এই বলে আক্রমণ করা হয়েছিল যে, যেহেতু এটা জার্মানীর মতবাদ তাই তারা এই মতবাদ আমদানী করে জার্মানীর দালালী করছে। সকলেই জানেন যে, এই মতবাদের স্রষ্টা রাশিয়া নয়, জার্মানী। কার্ল মার্কস যিনি এই তত্ত্বের স্রষ্টা, তিনি তাঁর দেশ জার্মানী থেকে বিতাড়িত হলেন — পরে ইংল্যাণ্ডে তাঁর মৃত্যু হল। এঙ্গেলস্ আর একজন মানুষ। যিনি কার্ল মার্কসের সহযোগী হিসাবে এই তত্ত্বের আর একজন স্রষ্টা, তাঁর বাড়ীও জার্মানীতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জার্মানী এই তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে, আর এই আদর্শকে গ্রহণ করে বিপ্লব করল রাশিয়া। রাশিয়ার পর এই মার্কসবাদী তত্ত্ব নিয়ে বিপ্লব করল চীন। চীন বিপ্লবের সময় চীনকে রাশিয়ার দালাল বলি চিহ্নিত করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এর দ্বারা রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে মিথ্যা প্রচার। মানুষের চেতনার অনুন্নত মনের সুযোগ নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটা সীমা থাকা দরকার। রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের অসচেতনতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সীমাটাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, সাধারণ মানুষ এসব নিয়ে ভাবেনা, গভীরভাবে চিন্তা করেনা। তারা সোজা সাধারণ ভাষায় কতগুলো কথা বলে। দেশের রাজনীতির মূল চরিত্র কি, সে সম্বন্ধেও তারা চিন্তা করে না।

তাছাড়া, দালাল কারা ইতিহাস তার প্রমাণ করেছে। কোন দেশের কমিউনিস্টরাই কারোর দালাল হয়নি। সব দেশের কমিউনিস্টরাই স্বাধীনতার মহান আদর্শের জন্য লড়ছে, তারা দেশের মুক্তির জন্য লড়ছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, তারা সমস্ত প্রকার শোষণের হাত থেকে জনগণের মুক্তির জন্য লড়াই করছে — তারাই হচ্ছে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীলরা এসব কথা মানবে না, আমরা জানি। তাদের স্বার্থ আলাদা — তাই তারা অন্য কথা বলছে। আসলে যারা ক্লীব জাতীয় লোক, যারা টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব বিক্রী করে, সেই মানুষগুলোকেই তারা বলে দেশপ্রেমিক। তা তাদের ইচ্ছে হয় তারা বলুক, কিন্তু সোভিয়েটের বক্তব্য ছিল, তাদের সাথে আন্তর্জাতিকভাবে একটা বোঝাপড়া হোক্ যে, তারা এহেন দেশপ্রেমিকদের(!) হয়ে কোথাও যাবে না। সোভিয়েট কথা দিচ্ছে, তাদের মত যারা বিপ্লবী এবং দেশের সুসন্তান তাদের জন্য তারাও যাবে না। সাম্রাজ্যবাদী শিবির কি এই শর্তে রাজী? যদি রাজী থাকে তাহলে চুক্তিতে সই করতে হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি মেনে চলার এই ছিল প্রকৃত অর্থ। অর্থাৎ একথার মানে ছিল, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি সাম্রাজ্যবাদীদের উপর চাপিয়ে দিতে হবে, তাদের মানতে বাধ্য করাতে হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের হাত থেকে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে রক্ষা করা।

যেমন, চীন বিপ্লবের কথা যদি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, কী ভয়ানক কষ্টের মধ্যে তাদের সে সময় পড়তে হয়েছিল। কে না জানে যে, তাদের যা শক্তি ছিল, তাতে চিয়াং কাইশেকের শক্তিকে তারা একটা

তোপে উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু, আমেরিকা তার পুরো সামরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে চিয়াং কাইশেকের পেছনে দাঁড়াল। ফলে, চীনের জনসাধারণকে কি শুধু চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়েছে? তাকে লড়তে হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত পুরো আমেরিকান শক্তি এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের বিরুদ্ধে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির উদ্দেশ্য ছিল, সাম্রাজ্যবাদী এই আক্রমণকে বন্ধ করা। দেশে দেশে বিপ্লবকে সাহায্য করার সমাজতান্ত্রিক দেশের দরকার নেই। সমস্ত দেশের বিপ্লব হয় সে দেশের বেশীরভাগ মানুষকে নিয়ে। কাজেই এটা নিজেই একটা অমোঘ শক্তি। রাশিয়াকে কে সাহায্য করেছিল বিপ্লবের সময়ে? কেউ না। অথচ, বিপ্লবের পর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ চারিদিক থেকে আক্রমণ করেও শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারেনি। আজ তো আর সে অবস্থা নেই। আজ তো দেশে দেশে বিপ্লবের জয়ডঙ্কা বাজানোর সময়। কোন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে আজ আর কেউ পরাস্ত করতে পারেনা। দেশে দেশে বিপ্লবের শক্তি আজ এমনই অমোঘ। জয়লাভের জন্য তার বাইরের সাহায্যের দরকার হয়ন। শুধু আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা দরকার। যেমন, ভিয়েতনামের মানুষ তাদের দেশে সমাজতন্ত্র হোক্ গণতন্ত্র হোক্, অথবা যে ধরণের স্বাধীন রাষ্ট্র তারা চায়, তা তারা তাদের দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করেই যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু, বাস্তবে বিষয়টা দাঁড়িয়ে গেল কি? দেশের যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দুদিনে কান ধরে তারা হঠাতে পারে, তার পিছনে গিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ, আমেরিকা, ব্রিটেন এবং সমস্ত শক্তিশালী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের সমস্ত সামরিক শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ফলে, ভিয়েতনামের নিরস্ত্র মানুষকে এই সম্মিলিত আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রতিটি দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের বিপ্লবী আন্দোলনকে আধুনিকীকরণের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী সামরিক শক্তি তার মোকাবিলা করতে হচ্ছে এবং তারই ফলে বিপ্লবগুলো মার খাচ্ছে। তাই দেশে দেশে শোষিত মানুষের বিপ্লবের এই জয়যাত্রা, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা আন্দোলনের এই জয়যাত্রাকে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করাই ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির তাৎপর্য।

আর, ক্রুশ্চেভ সেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির মানে দাঁড় করালো এইরকম যে, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে শান্তি থাকবে — মানে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশে এসে খাওয়াদাওয়া করুক, সমাজতান্ত্রিক দেশের সংস্কৃতির মধ্যে 'জাজ্ আমদানী করুক, টুইষ্ট নাচ শিখিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের ছেলেমেয়েদের মাথা খাক, মদ খাওয়া শেখাক, নাইট ক্লাবে যাওয়া শেখাক। আর, আমেরিকা বিভিন্ন দেশের ঘর চড়াও হয়ে যা করে বেড়াচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে সোভিয়েটের বক্তব্য হবে — বড় অন্যায় হচ্ছে, এতে যুদ্ধ লেগে যাবে, এ মানবতাবিরোধী কাজ হচ্ছে। কিন্তু, সোভিয়েট এগুলোকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করবেনা। কারণ, সে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি মেনে চলে। ফলে, সে এগুলো রুখতে কোথাও যাবেনা — সে নীতিবাগীশ। সে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মানে — অর্থ হচ্ছে, সে নীতিবাগীশের মত বসে বসে শুধু নীতি কপচাবে, আর আমেরিকাকে অপরের ঘর চড়াও হয়ে আক্রমণ চালাতে দিয়ে (এ্যালাউ করে) যাবে। এর নাম কি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে চলা? এর দ্বারা কি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে? এ চলতে পারেনা। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রকৃত অর্থ হল, সোভিয়েট কোথাও যাবেনা — মানে হচ্ছে, আমেরিকাকেও যেতে দেবে না। যুদ্ধজাহাজ নিয়ে গিয়ে ইজরাইলকে ইজিপ্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লাগানোর কোন অধিকার আমেরিকার নেই। মুক্ত জলপথে দস্যুবৃত্তি করে বেড়ানোর আমেরিকার কি অধিকার আছে? এ চলবে না। একদিন এ কথাটা বললে সাম্রাজ্যবাদীদের শোনানো যেতনা, কারণ তখন সোভিয়েটের সে শক্তি ছিলনা। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সে শক্তি আছে। সেই শক্তিটা প্রয়োগ করে তাকে কথা শোনানই ছিল সোভিয়েটের কাজ। এই ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির তাৎপর্য।

সোভিয়েট নেতৃত্বের আদর্শগত চেতনার অনুন্নত মান এবং বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকটের কারণ

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির তাৎপর্য ধরতে পারল না। আর এটা ধরতে না পারার কারণ, তাদের চেতনার অনুন্নত মান। এখন এই চেতনার অনুন্নত মান কি করে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হল, বা কোথা থেকে এল, সেটাও একটু বোঝা দরকার। যেমন ধরুন, বিজ্ঞানে একটা কথা

বলে যে, যে কোন উঁচু স্তর মানেই তা আপেক্ষিক অর্থে উঁচু স্তর। কারোর বোঝবার শক্তি খুব বেশী, বা কারোর চেতনার মান খুব উঁচু — একথার মানে হচ্ছে, তখনকার পরিবেশে তার চিন্তা-ভাবনা এবং জ্ঞানটা খুব উঁচু স্তরের। অর্থাৎ, আজকের পরিস্থিতিতে, আজকের সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে খুব উঁচুদরের বিশ্লেষণ তিনি করতে পারেন এবং খুব ভাল বুঝতে পারেন। কিন্তু, তার চেতনার মান যদি সেই জায়গাতেই থেকে যায় — সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যা যখন আসে, সেই পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে তিনি যদি নিজেকে আরও উন্নত করতে না পারেন — তাহলে আজকের এই উঁচু মানটা তুলনামূলকভাবে এই পরিবর্তিত অবস্থার সামনে, নতুন নতুন সমস্যার সামনে নীচু মান হয়ে পড়ে। এমন অনেক লোক আছেন — যাঁরা বিজ্ঞান জগতের বাইরের লোক, বিজ্ঞান সম্পর্কে যাঁরা কোন খবরই রাখেন না, বা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যাঁরা ষড়যন্ত্র করছেন, তাঁরা বিজ্ঞানে যখন নতুন নতুন তত্ত্ব আসে একটা তত্বের জায়গায় এর একটা তত্ত্ব আসে তখন তাঁরা বলেন, বিজ্ঞান সত্যের সন্ধান দেয়না। তাঁরা বলেন, বিজ্ঞান আজ বলছে এক কথা, আবার কাল বলছে আর এক কথা — ফলে বিজ্ঞানের আবার সত্য কি? কিন্তু, তাঁরা জানেনই না যে, বিজ্ঞান এরকম কথা কখনও বলেনি যে, তার আগের কথাটা ভুল। বিজ্ঞানে ইউক্লিড্-এর জিওমেট্রিও যেমন ঠিক, আবার আইন্ষ্টাইনের জিওমেট্রিও তেমনি ঠিক। ইউক্লিডের জ্যামিতি যে জায়গায় প্রয়োগ হয়, আইন্ষ্টাইনের জ্যামিতি সে জায়গায় প্রয়োগ হয় না। তাদের কর্মক্ষেত্রগুলো শুধু আলাদা। নিউটনিয়ান মেকানিকস্-এর যে কর্মক্ষেত্র ছিল, সেখানে সে আজও অভ্রান্ত ও সঠিক, সেক্ষেত্রে সে ভুল প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু, এখন কতকগুলো ক্ষেত্র আছে যেখানে নিউটনিয়ান মেকানিকস্ ইন্অ্যাডিক্যুইট'। ফলে, আইন্ষ্টাইনের তত্ত্বের জন্ম — আইন্ষ্টাইনের তত্ত্ব সেই ক্ষেত্রগুলোকে ধরে। তাই নিউটনের মেকানিকস্ এবং আইন্ষ্টাইনের তত্ত্ব — দুই-ই সত্য। তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র শুধু আলাদা। আবার নতুন একটা পরিস্থিতির সামনে, আরও কতগুলো নতুন সমসার সামনে পড়ে হয়তো দেখা যাবে যে, আইন্ষ্টাইনের তত্ত্ব সে সমস্যাগুলো ধরার ব্যাপারে 'ইনঅ্যাডিক্যুইট' হয়ে পড়েছে। তখন আবার বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হবে, নতুন তত্ত্বের জন্ম হবে। এইভাবেই বিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্বের অগ্রগতি হচ্ছে, সমস্ত বিষয়েরই ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কেও এ কথাটা সত্য। রাজনৈতিক জ্ঞান, অর্থনৈতিক জ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত ধারা সম্পর্কেই এই কথাটা সত্য।

সোভিয়েট ইউনিয়ন যেহেতু বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেশ, যেহেতু সে বিপ্লব করেছে, যেহেতু চীন বিপ্লব করেছে, মাও সে-তুং বিপ্লবের নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছেন, যেহেতু নানা বিষয়ে তাদের এত অভিজ্ঞতা — কাজেই তাদের চেতনার মান কখনও কোন সময়েই আপেক্ষিক অর্থেও নিম্নস্তরের হয়ে পড়তে পারে না। তাদের চেতনার এই যে উন্নত মানটা এখন আছে, তা সর্বকালের জন্যই উন্নত মান থাকবে — এ ধারণা ভুল। এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণা অনেক কমিউনিস্টরাই পোষণ করেন এবং এর থেকেই অন্ধতারও জন্ম হচ্ছে। কিন্তু, এ কথাটা সবসময়েই মনে রাখা দরকার যে, অন্ধতার সাথে কমিউনিজমের কোন সম্পর্ক নেই। অন্ততঃ কমিউনিজমকে আমরা যেভাবে বুঝেছি, আমাদের দল যেভাবে বুঝেছে, তাতে আমরা মনে করি যে, কমিউনিজমের সাথে অন্ধতার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা মনে করি, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ — যার ওপরে কমিউনিজমের তত্ত্বটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা এমন এক বিজ্ঞান — যা ক্রমাগত বিকাশলাভ (ডেভেলপ) করবে, উন্নত হবে, নতুন নতুন সমস্যার উপর নিয়ত আলোকপাত করবে। তাই কমিউনিস্টরা পুরানো সত্যগুলোকে উপলব্ধি করবে, নতুন সত্যগুলোকে ধরবার চেষ্টা করবে এবং এই পথেই মার্কসবাদকে ক্রমাগত বিকশিত ও উন্নত করবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে স্ট্যালিনের আমলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহু বিস্তৃতি সত্ত্বেও এবং স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি এবং সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও একথা সত্য যে, আদর্শগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দর্শন চর্চা বা জ্ঞানবিজ্ঞানের এই তত্ত্বগত দিকটার ওপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। ফলে, অর্থনৈতিক ও কারিগরী বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতির সাথে সাথে সমান তালে আদর্শগত চেতনার মানটা ক্রমাগত উঁচু না রাখতে পারার ফলে দুইয়ের মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক থেকে গিয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আদর্শগত চেতনার মান দ্রুত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আর, এইভাবে যদি চেতনার মান ক্রমাগত নীচে নামতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে তা আরও গভীরতর সঙ্কটের জন্ম দেবে — অর্থাৎ, সেইসময়ের নতুন নতুন জটিল সমস্যার সামনে এই নীচু মানের নেতৃত্ব পথ পাবে না। সেই সমস্ত সমস্যাকে মোকাবিলা করতে পারবে না। তার ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে নানা ক্লেদ তারা এনে ফেলবে।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। এর দ্বারা আমি যে কথাটা বোঝাতে চাইছি, তা হচ্ছে, কমিউনিজনের আদর্শের ভিত্তিতে প্রথমে বিপ্লব সংগঠিত করার যে চেষ্টা চলে দেশে দেশে — জাতীয়তবোধ, যা মুক্তি আন্দোলনের পরিপূরক, এবং তার ভিত্তিতে দেশাত্মবোধ তার সাথে সেই কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধ তো নেই-ই, বরং মিল আছে। কিন্তু, বিপ্লব হয়ে যাওয়ার পর, অনেকগুলো দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে একটা সত্যিকারের আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে হয়। এই ঐক্য বা বোঝাপড়াটা পুঁজিবাদী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে, অর্থাৎ আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে, বা ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে বোঝাপড়ার মত নয় — বা, এ বোঝাপড়াটা ভারতবর্ষের পুঁজিপতি এবং আমেরিকার পুঁজিপতিদের বোঝাপড়ার মতন নয়। এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বোঝাপড়া। এ হল কমিউনিস্টদের নিজেদের মধ্যে জাত্যাভিমান (ন্যাশনাল ভ্যানিটি) থেকে মুক্ত একটা বোঝাপড়া। তা আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের স্বার্থে, সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির স্বার্থে, সমাজতন্ত্রের স্বার্থে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সম্পূর্ণ জাত্যাভিমান থেকে মুক্ত একটা সত্যিকারের ঐক্যপ্রচেষ্টাকে বুঝিয়ে থাকে। এই জাতীয় মানসিকতা, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বা বিপ্লবের মুখে কোন ক্ষতি করেনি — বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে যদি সেই মানসিকতাকে দূর (ফাইট) করা না যায় এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের দ্বারা জনগণকে প্রভাবিত করা না যায়, তাহলে এই জাতীয়তাবাদী মানসিকতাই একদিন কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেবে। টিটোর সঙ্গে রাশিয়ার যখন প্রথম বিরোধ দেখা দেয়, তখন আমি এই কথাটা বলেছিলাম যে, যেভাবে কমিউনিস্টরা চলছে, জাতীয় রাষ্ট্রগুলোকে কেন্দ্র করে তাদের মানসিকতার মধ্যে যে জাতীয় অবমাননার (ন্যাশনাল হিউমিলিয়েশন) মনোভাব আজও খাদ হয়ে মিশে আছে — কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে, বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যান্ত্রিকতার যে প্রভাব আজও বর্তমান রয়েছে, আধিপত্যের যে মনোভাব কাজ করে চলেছে — এগুলি যদি থেকেই যায়, তাহলে এমনকি দেশে দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও যদি দেখা যায় — যা কেউ কল্পনা করেনি — কমিউনিস্ট দেশগুলো পরস্পর নিজেদের মধ্যে লড়ছে, তাহলেও আমি অবাক হব না।

আমি এতটা পর্যন্ত ভেবেছিলাম যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে যদি এই দোষগুলোর দূর করা না যায়, তাহলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ খতম হয়ে যাওয়ার পরেও, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির যে জাতীয় রূপ (ফর্ম) বর্তমানে রয়েছে, সেগুলোকে দূর করে আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠীর একটা কেন্দ্রীভূত সমাজ — যেখানে সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লীন হয়ে যাবে তেমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা দেবে। এইরকম একটি সম্মিলিত মানবগোষ্ঠীর কথা মানবতাবাদীরাও কল্পনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলও কল্পনা করেছেন। তাঁরা তাদের মত করে বিষয়টাকে কাল্পনিকভাবে চিন্তা করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা বিষয়টাকে বাস্তবরূপে চিন্তা করেছে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চিন্তা করেছে। আমি ভেবেছিলাম, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলোর কথা আমি বলে গেলাম তা যদি থেকেই যায়, তাহলে এই সম্মিলিত মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তা একটা সমস্যার সৃষ্টি করবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা হল এই যে, যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্বন্দ্বের একটা ফল (অ্যান অবজেক্টিভ আউটকাম অফ দি ইকনমিক কনিফ্লিক্ট)। কিন্তু এখন দেখছি, জাতিগত মানসিকতাকে এবং যান্ত্রিকতাকে ভিত্তি করে কমিউনিস্টদের মধ্যে যা চলছে তা যদি দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ অবলুপ্তির পরও তারাও এক নতুন বিপত্তি নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করবে। এ সমস্তই হচ্ছে কমিউনিস্টদের চেতনার অনুন্নত মানের (ইনঅ্যাডিক্যুইট স্ট্যান্ডার্ড) জন্য।

এখানে আমাদের দলের কর্মীদের একটা কথা মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে তাদের একটি অবশ্যকরণীয় কাজ হবে, জনসাধারণকে একথাটা বোঝানো যে, যা সত্য তা বলতে হবে। চীন যেখানে সত্য তুলে ধরেছে, যে জায়গাটায় ঠিক বলছে, সেটা সাহসের সঙ্গে তাদের বলতে হবে। বুর্জোয়ারা কী বলবে, তার জন্য পরোয়া করলে চলবে না। কারণ, সত্যকে তুলে ধরতে হলে তার বিনিময়ে কিছু দিতেও হয়, 'পে করতে হয় — চিরকাল দিতে হয়েচে, আজও দিতে হবে। এ কাপুরুষের কাজ নয়। আবার, সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, চীন কোন কথা বলছে বলেই তা সত্য — এরকম মানসিকতাও দূর করা দরকার। যেহেতু মাও সে-তুং একজন জ্ঞানীগুণী মানুষ সেইহেতু তিনি যা বলছেন তা সত্য, তার প্রতিটি বিশ্লেষণ অভ্রান্ত — এভাবে

চিন্তা করাও ঠিক নয়। তাকেও বিচার করে নিতে হবে। যেমন, তিনি যদি বলেন যে, ভারতবর্ষের বিপ্লবটা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লব এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতাই অর্জন করেনি, সেইটেই কি আমাদের গলাধঃকরণ করতে হবে এবং আমরাও তোতাপাখীর মত, তাই বলতে থাকব? আমার মতে এ জিনিস চলতে পারে না। এ হলে কমিউনিজম ভারতবর্ষে মরবে, তা মানুষের মধ্যে জায়গা করতে পারবে না। ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের ঘাড়ের ওপরে যে মাথাটা রয়েছে, তা কাউকে নকল করার জন্য নয়। তাদের ঘাড়ের ওপরে মাথাটা রয়েছে নিজেদের ক্রিয়া করার জন্য। তার জাত্যাভিমান থাকবে না, কিন্তু তার একটা স্বাধীনতা থাকবে, তেজ থাকবে এবং চিন্তার একটা নিজস্ব ভিত্তি থাকবে। এটা অনুকরণ করার জন্য নয়। এইখানেই রয়েছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিজ দেশের মানুষদের জয় করার, দেশের মাটিতে শিকড় গড়বার আসল রহস্য। নকলনবিশী করে সত্যিকারের বিপ্লবী আদর্শের শিকড় দেশের মাটিতে কেউ প্রোথিত করতে পারেনি।

তাদের মনে রাখতে হবে, চীন ও রাশিয়াকে কেন্দ্র করে এখন যে বিরোধ চলছে, তার মধ্যে মৌলিক তত্ত্বগত প্রশ্নের এই দিকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে এমন কতকগুলো অবাস্তব ধারণা তুলে ধরেছে, 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিং' সম্পর্কে এক অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে চলেছে, যার ফলে তারা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে শুধুমাত্র পরোক্ষ সমর্থন (প্যাসিভ সাপোর্ট) দিয়ে চলেছে। চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য যে ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন, তা তাদের পক্ষে দেওয়াই সম্ভব হচ্ছে না। যেমন, ভিয়েতনামকে রক্ষা করার যে দায়িত্ব তাদের ছিল, সেখানে তারা ভিয়েতনামকে ঠিক ততটুকু সাহায্যই করছে, যতটুকু একটা রাষ্ট্র সাধারণভাবে আর একটা রাষ্ট্রে দুঃসময়ে করে থাকে। অথচ, তাদের ঘোষিত নীতি (প্লেজ) ছিল যে, তার যে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের ওপর আক্রমণ সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ বলে গণ্য করবে। কিন্তু, আজ যখন আমেরিকা প্রতিদিন উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমা বর্ষণ করছে — তাদের অর্থনীতি, তাদের শিল্প, কলকারখানা, তাদের রাস্তাঘাট, সেতু বাঁধ এবং সমস্ত জনসাধারণের উপর হামলা চালাচ্ছে — সেখানে সোভিয়েট সাহায্যের নামে ভিয়েতনামকে শুধু আত্মরক্ষা করার মত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ, সোভিয়েটের সাহায্যের প্রকৃতিটা এরকম যে, আমেরিকান প্লেন হামলা করতে এলে তারা শুধু সেগুলোকে গুলি করে ফেলে দিতে পারে — তার বেশী নয়। এগুলোর দরকার নেই — আমি তা বলিনা। এগুলো না পেলে ভিয়েতনামের আরও অসুবিধা হত — একথা সত্য। তার জন্য ভিয়েতনাম তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পারে। কারণ, যতটুকু সাহায্য সোভিয়েটের কাছ থেকে সে পাচ্ছে তা তার কাজে লাগছে। কিন্তু, সোভিয়েট কি করছে? যে সাহায্য সে দিচ্ছে, তার মানে হচ্ছে শুধু প্লেন এলে তারা ফেলে দিতে পারে। তাও আবার কতটুকু দিচ্ছে? তা এমন নয় যে, তাকে প্লেন ফেলবার একটা ব্যাপক (ম্যাসিভ) উপকরণ বলা যায়।

ভিয়েতনামে সোভিয়েট সাহায্যের প্রকৃতি কার্যত মার্কিন যুদ্ধ অর্থনীতিকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে

এখন কেউ যদি সোভিয়েটকে এ প্রশ্নটা করে যে, তার দেশ সোভিয়েটের ওপর, অর্থাৎ যদি মস্কো বা পেত্রোগ্রাদের উপর কোনও একটা উপলক্ষে আমেরিকান প্লেন ভূমধ্যসাগরীয় ষষ্ঠ ফ্লিট থেকে, বা তুরস্কের ঘাঁটি থেকে, বা ইসরায়েলের ঘাঁটি থেকে উড়ে উড়ে এসে এরকম ক্রমাগত বোমা বর্ষণ করে, সেতু, বাঁধ ভাঙ্গত, তাহলে সে কি করত? সেই অবস্থাতেও কি সে ওখানে বসে শুধু প্লেন দেখত? আর বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে এই ভয়ে শুধু বলত — দেখ, আর এরকম করোনা, এ বড় অশান্তি হচ্ছে — তোমরা কিন্তু আক্রমণ করছ। এইভাবে আমেরিকাকে সে ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে দিত? যদি না দিত, তাহলে কি করত? এটা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে, সে পাল্টা আক্রমণ (রিটালিয়েট) করত, যে ঘাঁটি থেকে আমেরিকা ক্রমাগত আক্রমণ করত, সেই ঘাঁটিটা উড়িয়ে দিত, অর্থাৎ আমেরিকার আক্রমণের গোড়ায় আঘাত করত। এটা আশা করাই স্বাভাবিক। অথচ, ভিয়েতনামের ব্যাপারে সোভিয়েট তা করছেনা কেন? যদি না করে থাকে, তাহলে সোভিয়েট নিজ দেশের নিরাপত্তা আর উত্তর ভিয়েতনামের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনা। তাদের কাছে এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই যদি হয়, তাহলে তো তার মুখে আর সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা শোভা পায়না। তাহলে বড় বড় কথা বলার তার কি প্রয়োজন ছিল? তাহলে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে এই পরামর্শই বা সোভিয়েট দিয়েছিল কী করে যে, তাদের আণবিক শক্তির দরকার নেই — কারণ, সোভিয়েটই দরকার মত তাদের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ থেকে রক্ষা

করবে? এখন কি সে রক্ষা করছে? যে সাহায্য সে ভিয়েতনামকে দিচ্ছে, তার নাম কি রক্ষা করা?

এক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতারা আমেরিকার আর একটা রাজনীতিও ধরতে পারেননি। তাঁরা ভাবছেন, যে সাহায্য তাঁরা ভিয়েতনামকে দিচ্ছেন তাদের রক্ষা করার জন্য, সেটাই যথার্থ সাহায্য। একথা ঠিক, এই সাহায্যটা এক অর্থে ভিয়েতনামকে খানিকটা আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করছে, কিন্তু এর আর একটা দিকও রয়েছে। সেটা একটা অত্যন্ত কঠোর এবং বাস্তব দিক। সে বাস্তব দিকটা কি? আমেরিকা তার অর্থনীতির প্রয়োজনে সর্বদা যে যুদ্ধ জিইয়ে রাখতে চাইছে, সেই যুদ্ধ সে একতরফা করতে পারে না। ফলে যার সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে, তারও যুদ্ধ করার মত খানিকটা অন্ততঃ শক্তি যেখান থেকে হোক্ সংগ্রহ করা দরকার। ভিয়েতনামকে সেই শক্তিটুকুই সোভিয়েট যোগাচ্ছে — যার ফলে আমেরিকার মজুদ অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার ক্ষেত্রে সে কার্যতঃ সাহায্য করছে। কারণ, তারা ধরতেই পারেনি, আমেরিকার অর্থনীতির প্রয়োজনেই তার মজুদ অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংস হওয়া দরকার। কারণ, অস্ত্র ধ্বংস না হলে, বিমান না নষ্ট হলে, শিল্পের সামরিকীকরণের মধ্য দিয়ে তার নিজের দেশের অর্থনীতি যে তেজীভাব তারা বজায় রাখতে চাইছে, আর অর্থনীতিতে সেই তেজীভাব থাকবেনা। সামরিক শিল্পে তৈরী তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমে যাবে, গুদামজাত হয়ে যাবে। অথচ, সোভিয়েট মনে করছে, আমেরিকার প্লেনগুলিকে ধ্বংস করার যে উপকরণ সে ভিয়েতনামকে দিচ্ছে, তাতে আমেরিকা শায়েস্তা হচ্ছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এতে আমেরিকা শায়েস্তা হচ্ছেনা। তার বরং এক অর্থে সুবিধাই হচ্ছে। ফলে, আমেরিকা যখন ঘর চড়াও হয়ে যুদ্ধ করছে, তখন ভিয়েতনামকে শুধু আমেরিকার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এমন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে যাওয়ার দ্বারা যাঁরা মনে করছেন, ওতে আমেরিকার মস্ত বড় ক্ষতি হচ্ছে, তাঁরা ভুল করছেন।

আমেরিকার ওখানে যে ক্ষতিটা হচ্ছে, সেই ক্ষতিটা হচ্ছে রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে আমেরিকার বহু মানুষ ভিয়েতনামের যুদ্ধে মারা যাচ্ছে, বহু মা সেখানে পুত্রহারা হয়েছে, বহু স্ত্রী স্বামী হারিয়েছে, বহু বোন ভাই হারা হয়েছে। ফলে, তার একটা প্রভাব আমেরিকার জনসাধারণের উপর পড়ছে। তারা ভাবতে শুরু করেছে, কিসের জন্য এই লড়াই? কার জন্য তারা সেখানে লড়ছে? তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে যে, পেন্টাগণের কর্তারা তাদের যা বোঝাচ্ছেন তা কি সত্য? নাকি সত্য অন্যরকম? কারণ, মানুষকে সেখানে সত্য জানতে দেওয়া হয়না। এমন একটা মানসিকতা সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে যে, সরকার যা বলবে তাই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। বিষয়টা এরকম হলে সরকার যা বলছে তা সত্য কিনা, বিচার হবে কি করে? বিশেষ করে সরকারই যেখানে একটা জোচ্চোরদের আড্ডা, ক্রিমিনালদের আড্ডা, সেখানে বিষয়টাতো সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। ফলে, জনগণকে বিচার করতে দিতে হবে। তাছাড়া সরকার যা বলছে তাই যদি সত্য হয়, তাহলে জনসাধারণকেও কথা বলবার এবং প্রকাশ করবার অধিকার দিতে তাদের এত আপত্তি কেন? জনসাধারণ নিজেরাই যাতে সত্য কোন্‌টা তা বিচার করে নিতে পারে, সেই অধিকার তাদের দেওয়া হোক্। না, তা তারা দেবেনা। তাদের ভাবটা হচ্ছে, তারা যা বলবে তাই সত্য এবং তাই মেনে নিতে হবে। তাদের কথার বাইরে অন্য কথা বলার মানেই হল, অসত্য বলা এবং দেশদ্রোহীতা করা। এইভাবে আমেরিকার সরকার সত্য কথাটা তাদের দেশের মানুষকে জানতে দেয়নি। আমেরিকার মানুষও তাদের খাওয়া-পড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এতদিন মহা আনন্দে ছিল। এই সমস্ত কথা নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। তারা একটা চিরাচরিত কমিউনিস্ট বিদ্বেষ থেকে এতদিন ভেবেছে যে, কমিউনিস্টরা খারাপ। কারণ, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প-কাহিনী তাদের শোনানো হয়েছে। এইসব শুনে তাদের ধারণা হয়েছিল, কমিউনিস্টরা প্রায় গণ্ডারের মতনই একটা কিছু, বা একটা গরিলাও বা যা একটা কমিউনিস্টও তাই — এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এইরকম সব ধারণা কমিউনিস্টদের সম্পর্কে পরিকল্পিতভাবে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কিন্তু, তাদের মধ্যে যারা দুনিয়ার নানা দেশ ঘুরেছে, নানা লোকের কথা শুনেছে, তারা ধীরে ধীরে বিষয়টাকে বুঝতে শুরু করেছে। বার্ট্রান্ড রাসেল, জাঁ পল সার্ত্রে — যাঁদের জ্ঞানীগুণী হিসাবে আমেরিকার জনসাধারণের উপর একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে — তাঁরাও আমেরিকার বিরুদ্ধে বলছেন। ফলে, এই সমস্ত কিছুর প্রভাব আমেরিকার জনসাধারণের উপর পড়ছে। তাছাড়া তারা নিজেরা দেখছে, যুদ্ধে দেশের ছেলেমেয়েরা মরছে। যে সমস্ত মানুষ যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, তারা অন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসছে। যুদ্ধে যাওয়ার সময় তারা সরল বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছে যে, তারা সেখানে ন্যায়ের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার

জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। অথচ, সেখানে গিয়ে দেখছে বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। তারা দেখছে যে, সেই দেশের মানুষগুলোই আমেরিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। সে দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজনও তাদের পক্ষে নেই। ফলে, যারা ভিয়েতনামে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেকে সেখানে গিয়ে বিগড়ে যাচ্ছে। আর, এই বিগড়ে যাওয়া লোকগুলো যখন দেশে ফিরে আসছে, তখন রাষ্ট্র তাদের চেপে দিচ্ছে, চাকরী থেকে তাদের বরখাস্ত করে দিচ্ছে — যাতে তারা মিলিটারীর মধ্যে হতাশা এবং অসন্তোষ ছড়াতে না পারে এবং তাদের মনোবল ভেঙে দিতে না পারে। এই সমস্ত কিছুর ফলে ধীরে ধীরে ঘটনার প্রকৃত রূপটা আমেরিকার জনসাধারণ ধরতে পারছে। তাদের মনে প্রশ্ন উঠছে যে, ভিয়েতনামে কার স্বাধীনতার জন্য তারা লড়াই করতে যাচ্ছে? যে লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে মারা গেল, তারা কিসের জন্য প্রাণ দিল? তারা কি ওই 'কী' সরকারের মত দালালদের জন্য সেখানে লড়াই করছে? অথবা, পেন্টাগণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য লড়াই করছে? নাকি, ওয়াল স্ট্রীট-এর বড় বড় কর্তা যারা — যারা যুদ্ধ ব্যবসায়ী, যারা যুদ্ধাপরাধী — যারা যুদ্ধের মাল বিক্রী করে খায়, তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য লড়াই করছে? যদি তাই হয়, তাহলে আমেরিকার জনসাধারণের তাতে কি স্বার্থ? ফলে, আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা নতুন জাগরণ এসেছে।

উন্নত নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান ভিয়েতনামের কমিউনিস্টরা মার্কিন দেশের জনগণকেও অনুপ্রাণিত করেছে

একজন মার্কিন সাংবাদিক যখন যুদ্ধ চলছে, সেইসময় উত্তর ভিয়েতনামের একটা বর্ণনা দিয়েছেন। আর তার সঙ্গে সায়গন শহরেরও একটা বর্ণনা দিয়েছেন — যে সায়গন আমেরিকান ডলারে ছেয়ে গেছে। খবরে জানা যায়, শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে ভিয়েতনামের মনোভাব এবং দু'টো দেশের একটা তুলনামূলক রিপোর্ট দেবার জন্য সরকারীভাবে তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজে এই খবর ছাপা হয়েছিল। তিনি তাঁর লেখায় দুটো দেশের চেহারার এবং দুটো দেশের নৈতিক মানের একটা তুলনামূলক বিচার করেছেন এবং দেখিয়েছেন, আমেরিকা যাদের রক্ষা করবার নামে সেখানে যাচ্ছে, তাদের চরিত্র এবং রূপ বাস্তবে কি? এরই পাশাপাশি উত্তর ভিয়েতনামের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা পড়লে অবাক লাগে। সেখানে তিনি বলছেন যে, উত্তর ভিয়েতনামের একদিকে যুদ্ধ চলছে, তার উপর বোমাবর্ষণ হচ্ছে — অন্যদিকে ভোর চারটে বাজতে না বাজতে লোক এসে রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছে। অথচ, সায়গনে — যেখানে আমেরিকা লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে — সেখানে ময়লা কলকাতা শহরের চেয়ে বেশী রাস্তাঘাটে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বেলা দশটা-বারোটার আগে সেখানে ঘর থেকে লোকজন বেরোয় না। রাস্তাগুলি ঝাড়ু দেওয়া বা পরিষ্কার করা প্রায় হয়ই না। পাশাপাশি দু'দেশের নৈতিক মানের একটা ছবিও তিনি দিয়েছেন। উত্তর ভিয়েতনামের ছেলেমেয়েরা কীভাবে আচরণ করে, তাদের নীতিনৈতিকতার মান কি, তাদের নাগরিক জীবন কেমন, সে সম্পর্কে একটা বর্ণনা তিনি সেখানে দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, এতবড় একটা বিধ্বংসী যুদ্ধ যেখানে চলছে, তার মধ্যে মেয়েরা সমস্ত কাজ করছে। তারা ওপরে পাহারা দিচ্ছে, বোমাবর্ষণের সময় আবার নীচে নেমে আসছে। অন্য পাঁচটা কাজ করছে। তার মধ্যে আবার গান করছে, থিয়েটার করছে, নানাপ্রকার আনন্দের আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমস্ত সমাজে প্রাণসঞ্চার করছে। এ যেন একটা নতুন জীবন। তাদের মধ্যে কোনপ্রকার ভয় নেই, ব্যভিচার নেই, দেশের চিন্তা ছাড়া তাদের অন্য কোন মনোভাবনা নেই। কোথা থেকে এ জিনিস তাদের মধ্যে আসছে? এই নতুন জীবনবোধ, এই চেতনা, নীতিনৈতিকতার এই মান তাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কি করে? কারণ, তারা কমিউনিজমের মহান আদর্শে ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আর তার ফলেই তাদের পক্ষে আচরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটা এরকম ছিল যে, সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। একটি মাত্র দেশ থেকে শুরু করে দেশে দেশে কমিউনিস্টরা বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী আন্দোলনগুলি দানা বেঁধে উঠছে। আমেরিকার এত আক্রমণ সত্ত্বেও এবং তার বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন কার্যকরী বাধা না থাকা সত্ত্বেও ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলো স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বহু বিপত্তির মধ্যে ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষ লড়াই করছে এবং দেশে দেশে জনতার শোষণমুক্তির লড়াইগুলো শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে, দুনিয়াজোড়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে

কমিউনিস্ট আন্দোলন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে। কমিউনিস্টদের দুর্বার অগ্রগতিকে যেন আর আটকানো যাচ্ছেনা — এই আতঙ্কে সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমাগত অধিকতর ভীত হয়ে উঠছে। অথচ, সাম্রাজ্যবাদের এত দুর্বল হয়ে পড়া, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এবং দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর এত শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও এযুগে সাম্রাজ্যবাদীদের এই দাপট অপরের ঘাড়ে চড়াও হয়ে এই আক্রমণ — এইসব ঘটনা সত্যিই অদ্ভুত। তাই আমি বলেছিলাম যে, আমরা কমিউনিস্টরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দশ গজের মধ্যে যখন এসে পৌঁছে গিয়েছিলাম, এমন সময় আমাদের কানামাছিতে পেয়ে গেল। নানা মিথ্যাচার, নানা তত্ত্বগত বিভ্রান্তির ফলে আমরা আবার অনেক মাইল দূরে পিছিয়ে চলেছি। এটা ঘটতে পারল কমিউনিস্ট আন্দোলনে আদর্শগত সংগ্রামের দুর্বলতা এবং চেতনার অনুন্নত মানের জন্য।

উন্নত আদর্শ, তত্ত্ব ও চরিত্রের সাধনা দরকার

তাই শুধু লড়াই, শুধু স্লোগান এবং যে কোন উপায়ে দলের শক্তিবৃদ্ধির কথাই যাঁরা ভাবেন, তাদের আমি একটা কথা ভেবে দেখতে বলি। আমাদের দেশেও কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী তথাকথিত দলগুলির মধ্যে এই মানসিকতা আছে এবং সতর্ক না থাকলে আমাদেরও এই মানসিকতা যে কোনদিন ছেয়ে ফেলতে পারে। শক্তিবৃদ্ধি হলে তাঁরা আর চোখে-কানে পথ দেখতে পাননা। তাদের মাথা ঠিক থাকেনা। তাঁরা আদর্শের দিক থেকে কতদূর এগোচ্ছেন, তাদের মধ্যে তত্ত্বগত চেতনার মান বাড়ছে কিনা, যেসব কর্মীরা তাদের দল ভারী করছে সেইসব কর্মীরা সঠিক কমিউনিস্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ কিনা, তাদের মধ্যে উন্নত কমিউনিস্ট নৈতিকতার ভিত্তি আছে কিনা, আদর্শবাদ আছে কিনা — নাকি তারা শুধু শ্লোগানসর্বস্ব কর্মী, শুধু দলের শক্তিবৃদ্ধি করছে — এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি তারা কোন নজর দেন না। শক্তিবৃদ্ধির নামে যারা এসে তাদের দলে ভিড় করে, দলের সভ্য হিসাবে তাদের পরিচয়টা জানা না থাকলে রাস্তার একটা রকবাজ ছেলের সঙ্গে কোন পার্থক্যই তাদের খুঁজে বের করা যাবে না। এইভাবে দল ভারী করলে দলের কর্মী সংখ্যা হয়তো তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, পার্লামেন্টারী রাজনীতির আসরও হয়তো গরম হয় এবং তাদের নেতা হওয়ার বা প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সুবিধা হয় — কিন্তু, তার ফলে বিপ্লবের গোটা মানসিকতাটাই মার খায়। কারণ, সাধারণ মানুষ, যারা কমিউনিজম এবং কমিউনিজমের ভাবাদর্শকে বুঝতেও চায়, তারা ঐ নীচু স্তরের কর্মীদের আচার-ব্যবহার দেখে সেই কমিউনিজম সম্পর্কেই বিগড়ে যায়। প্রতিদিন এদের সঙ্গে মেলামেশার দ্বারা তারা দেখে যে, যারা কমিউনিজমের কথা বলছে, পাড়ার অন্যান্য রকবাজ ছেলেদের সাথে তাদের কোন পার্থক্য নেই — জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, নীতিনৈতিকতা, সমস্ত দিক থেকে তারা ঐ রকবাজ ছেলেদের মতই। যদি না জানা থাকে যে, এই ছেলেটা কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার, তাহলে অন্যদের থেকে আলাদা করে তাকে চেনবারই উপায় নেই। সেজন্যই বিপ্লবীদের উন্নত আদর্শগত ও নৈতিক মান অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ

যাই হোক্, আজকের সভায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার আর বেশী কিছু বলার উপায় নেই। কারণ, জাতীয় পরিস্থিতির উপরেও আমাকে এখানে কিছুটা বলতে হবে। আমি শুধু এইটুকু বলেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ করছি যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই আদর্শগত সংগ্রামের দুর্বলতা, ত্রুটিবিচ্যুতি এবং নেতা ও কর্মীদের চেতনার অনুন্নত মানের জন্যই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতিও নষ্ট হয়ে গেল। এর ফলে দেশে দেশে জনতার মুক্তি আন্দোলনের পিছনে সংযুক্তভাবে একটা সংহতির ভিত্তিতে দাঁড়ানোর বদলে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নিজেরাই টুকরো টুকরো হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের খানিকটা সুবিধা করে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের এই অনৈক্যের ফলে একটা সাময়িক সুবিধা সাম্রাজ্যবাদীদের হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু, এতে সাম্রাজ্যবাদীদের খুশী হওয়ার কিছু নেই। বরং আমি মনে করি, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এই দুর্বলতাটা এখন প্রকাশ হওয়ার একদিক থেকেই মঙ্গলই করে দেবে। এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ না হয়ে আরও কিছুদিন পরে প্রকাশ হলে আরও কিছু বেশী ক্ষতি হত। আজ এই জিনিসটা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ফলে দুনিয়াজোড়া কমিউনিস্টদের মধ্যে একটা ভাবনা এসেছে যে, আদর্শের চর্চা দরকার, আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্বের চর্চা দরকার। তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি দেখা দিতে শুরু করেছে যে, শুধু শ্লোগান আউড়ে বিপ্লব করা যাবে না। এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সংহতি ও রক্ষা করা যাবেনা। আর, চেতনার মান যদি উন্নত না করা যায়, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ঝাণ্ডাকে উর্দ্ধে তোলা না যায়, তাহলে জাতীয়

মানসিকতাকে ভিত্তি করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পরস্পর লড়াই করবে — চেতনার মান যদি তাদের নীচেই থেকে যায়, তাহলে জাতীয় মানসিকতাকে ভিত্তি করে লড়াই করতে তারা বাধ্য, না করে তাদের উপায়ই থাকবেনা।

* বক্তৃতার জাতীয় পরিস্থিতির অংশটা বাদ দিয়ে কেবল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অংশটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ ঃ
২২ নভেম্বর, ১৯৭৬ 'গণদাবী'তে
৭ নভেম্বর, ১৯৬৭-তে ভাষণটি প্রদত্ত হয়।